সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ১২৭

শামসুদ্দীন নওয়াব

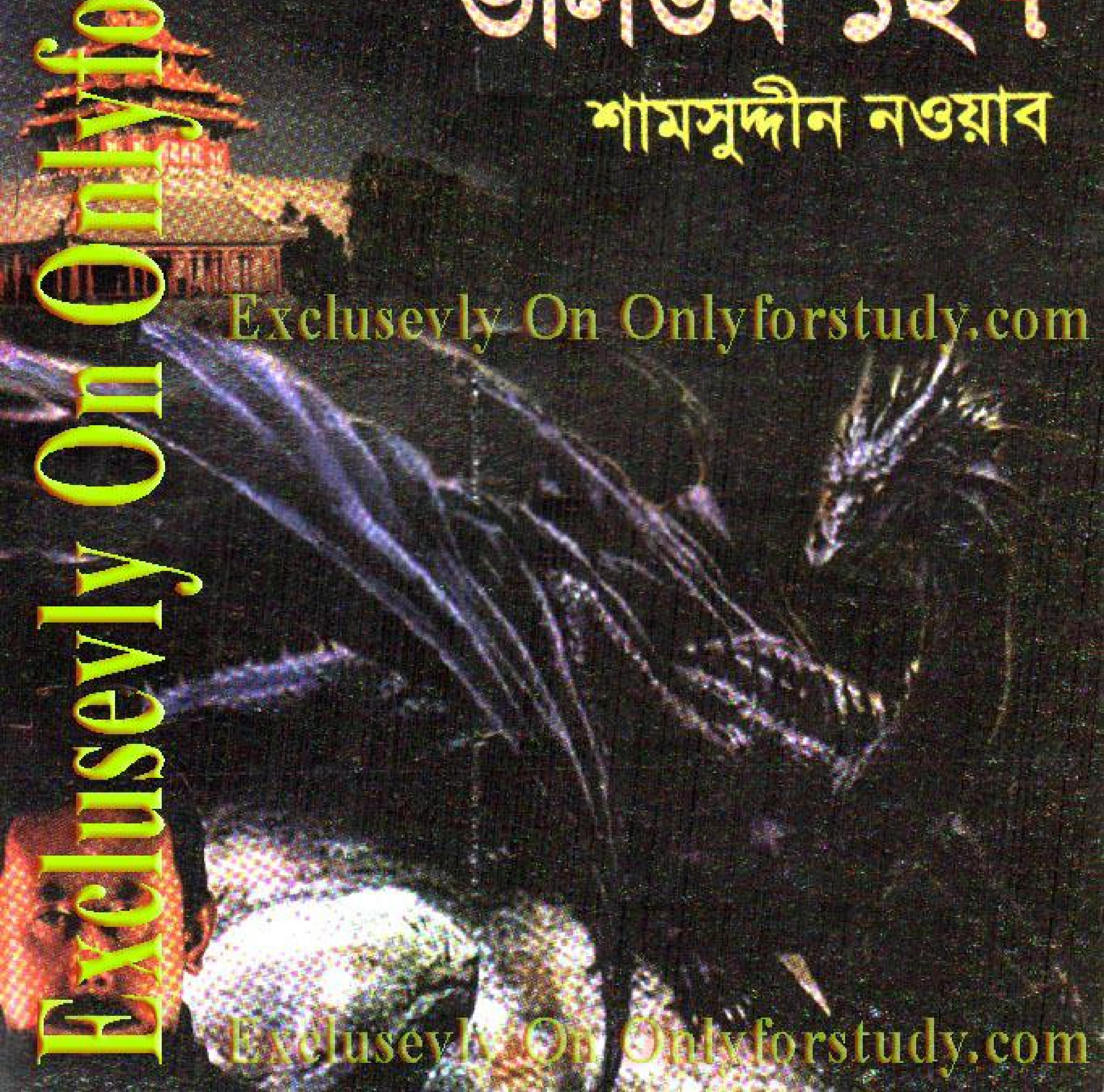

Exclusevly On Onlyforstudy.com
Exclusevly On Onlyforstudy.com
Exclusevly On Onlyforstudy.com

তি. গো. ভ. ৯১	(ক্যামেরার চোখ+ভ্যাম্পায়ারের ছায়া+ভুতুড়ে বাড়ি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯২	(জিন্দালাশের পিছে+অগ্নিগিরি অভিযান+গবলিনের কবলে)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯৩	(পিশাচের আস্তানা+উড়ন্ত রবিন+অন্য ভুবনের কিশোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯৪	(সময়সুড়ঙ্গে আবার+হিমপিশাচের কবলে+ছায়ামানবী)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৯৫	(মরণসঙ্কেত+জলদস্যুর গুপ্তধন+গোলমাল)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৯৬	(সাগরতীরে তিন গোয়েন্দা+দ্বীপরহস্য+দুর্গরহস্য)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৯৭	(ভেল্কিবাজ+মঙ্গলের অতিথি+প্রেতচক্র)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৯৮	(ঝড়ের দ্বীপ+জিন্দালাশের মুখোমুখি+তুষারগিরি-রহস্য)	
তি. গো. ভ. ৯৯	(রুদ্র সাগর+মূর্তি চোর+মহাকাশের দূত)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০০	(নিঝুমপুরের কাণ্ড+তুষারদানো+খুলিগুহার রহস্য)	৫৬/-
তি. গো. ভ. ১০১	(প্রেত বৈমানিক+ছায়া কালো কালো+বাতিঘরের পিশাচ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১০২	(গুপ্তদূত+গ্রহান্তরের বন্ধু+জাদুঘরের দানব)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১০৩	(মাদক-রহস্য+গুপ্তধনের নকশা+ভয়ের মুখোশ)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১০৩/২	(অদ্ভুত পাথর+দানবের চোখ+হারানো মমি)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ১০৪	(নিখোঁজ মেয়ে+মৃত নগরী+বনের খাঁচায়)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১০৪/২	(গোরস্থানে সাবধান!+নেকড়ের বনে+খাবারচোর)	৫১/-
তি. গো. ভ. ১০৫	(ভুতুড়ে ট্রেন+ইয়েতি-রহস্য+ক্যাপ্টেন কিডের গুপ্তধন)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১০৫/২	(লকেট-রহস্য+শুটকির পেট শো+পান্না-রহস্য)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৬	(ভুতুড়ে শহর+ রোবট-রহস্য+পান্না-রহস্য)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ১০৬/২	(লাটসাহেব+পাজি বিড়াল+ভৌতিক দুর্গ)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ১০৭	(যন্ত্রপিশাচ+বিভীষণের জাগরণ+কঙ্কাল-রহস্য)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১০৭/২	(টেরোড্যাকটিলের থাবা+পাহাড়ী দানো+রাজকুমারের খোঁজে)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৮	(অভিশপ্ত হোটেল+সবুজ মৃত্যু+হারকিউলিস-রহস্য)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১০৮/২	(বনভূমির আতঙ্ক+বামন ভূত+ড্রাকুলার আলখেল্লা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৯	(ওয়্যারিয়ম্যান+খুনে রোবট+নেকড়ের গর্জন)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১০৯/২	(আবার মায়ানেকড়ে+টি-রেক্স-রহস্য+বনের ডায়েরি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১০	(বিদায়, মুসা!+বাক্স-রহস্য+মৃত্যু-মমির অভিশাপ)	৭৬/-
তি. গো. ভ. ১১০/২	(অদৃশ্য হাত+সার্কাসের তাঁবু+চাঁদের মানুষ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১১	(ঠগবাজ+মৃত্যুর মুখোমুখি+হারানো ক্যামেরা)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১১/২	(দুঃস্বপ্নের খেলা-১+দুঃস্বপ্নের খেলা-২+ডাইনোসরের উপত্যকা)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ১১২	(জাদুকরের ভেল্কি+মিশর-রহস্য+হিম মৃত্যুর ফাঁদে)	৭৯/-
তি. গো. ভ. ১১২/২	(ছায়ামূর্তি+গ্রহান্তরের দুঃস্বপ্ন+ভুতুড়ে খামার)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১১৩	(নির্জন উপত্যকা+ভিনগ্রহে বিপদ+ডাইনীর কবলে)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ১১৩/২	(ফুলচোর-১ ও ২+গৃহযুদ্ধ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১১৪	(বুদ্ধির খেলা+অরণ্যের প্রতিশোধ+ভুতুড়ে বিমান)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ১১৪/২	(ম্যাজিক শো+কালঘুম+মঞ্চনাটক)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১১৫	(ঘোড়াচোর কিশোর+জাদুর ঘোড়া+দ্বীপের দানো)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১১৫/২	(পাহাড়ে আতঙ্ক+ভুতুড়ে বর্ম+ভূমিকম্প)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১১৬	(দৈত্যের গুহায় তিন গোয়েন্দা+রহস্যজাল+গ্রীনহিলসের গুপ্তধন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১১৬/২	(আঁধারে কে+জলাভূমির আতঙ্ক+ভুতুড়ে দুর্গ)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১১৭	(সময়সুড়ঙ্গে মহাবিপদ+খুন-রহস্য+ছুটিতে ছোটাছুটি)	৫১/-
তি. গো. ভ. ১১৭/২	(আমিই কিশোর+আলাস্কা অভিযান+আমাজানের গহীনে)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ১১৮	(চোরের পিছে+গোলকধাঁধা+চিঠির ফাঁদে)	৫১/-
তি. গো. ভ. ১১৮/২	(বিভীষিকার প্রহর+আমাজনের ভয়ঙ্কর!+জিন্দালাশ ভার্সেস তিন গোয়েন্দা)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১১৯	(কালকেউটের ছোবল+ফারাও রানীর পিরামিডে+বিপদে মুসা!)	৬৯/-
তি. গো. ভ. ১১৯/২	(ভয়াল সেই রাত+ভুতুড়ে আয়না+জঙ্গলে বিপদ!)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১২০	(ভয়াল দানোর কবলে+কঙ্কাল উধাও+শাপমোচন)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ১২০/২	(ওপার থেকে+জ্যান্ত ভূত+ দেবতার শহরে)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ১২১	(শ্যারনের ডায়েরি+ড্রাকুলার কফিন+খেলার আসর)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১২১/২	(কুয়াশাদ্বীপ+ভুতুড়ে বনের রহস্য+নেকলেস-রহস্য)	৫৬/-
তি. গো. ভ. ১২২	(কালো জাদুকরী+গুপ্তধন উদ্ধার+বাজ পাখির পালক)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ১২৩	(অভিশপ্ত দ্বীপ+কঙ্কাল শহর+আবার রেসের ঘোড়া)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ১২৪	(মৃত্যুর ডাক+শেষ চিৎকার +ভয়ের বাঁশি)	৭৫/-
তি. গো. ভ. ১২৫	(জল্লাদের কবলে+পিশাচীর হাসি +ভয়াল দ্বীপ)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ১২৬	(ড্রাগনের গুহা+মুণ্ডুকাটা ভূত +গুহামানবের দেশে)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১২৬/২	(নিখোঁজ বিমান+শিকারী বাজপাখি+সময়-সুড়ঙ্গের রবিন)	৭৯/-
তি. গো. ভ. ১২৭	(অমঙ্গলের ছায়া+খুনি লাশ+ড্রাগনরাজার দেশে)	৫৬/-

অমঙ্গলের ছায়া

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

এক

নাহ্, ডনের জ্বালায় আর পারা যায় না, মনে মনে বলল কিশোর। বিচ্ছুটা ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে শুতে না এলে মেজাজ ধরে রাখা কষ্টকর হবে ওর জন্য।

পৌনে একটা বাজে। সামনে লম্বা রাত পড়ে আছে।

কিশোরের অন্ধকার বেডরুমে এখনও পপকর্ন আর নেইল পলিশের গন্ধ ভাসছে। ডন সন্ধেবেলায় কিশোরের কুকুর বাঘার নখে উজ্জ্বল গোলাপী পলিশ লাগিয়েছে। শুধু যে একটু পরপরই লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে যাচ্ছে-আসছে ডন তাই-ই নয়, সারা ঘরে পপকর্ন ছড়িয়ে যা-তা কাণ্ড করেছে। ডন দুঃস্বপ্ন দেখেছে বলে ওকে নিজের কামরায় থাকতে দিয়েছে কিশোর। কিন্তু আর তো সহ্য হচ্ছে না। বিচ্ছুটা ওকে পাগল করে তুলছে।

এক কোনায় বাঘার বিছানা। ও ওখান থেকে মৃদু গর্জন ছাড়ল।

'তুমি বাঘাকেও বিরক্ত করছ, ডন। তোমাকে কয়বার বলব জানালা থেকে সরে এসো?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। পাজামা পরা ডনকে দেখে লাল-সবুজ মেক্সিকান জাম্পিং বিনের মত লাগছে।

জানালার সঙ্গে সেঁটে থাকা ডন শ্বাস চাপল।

'একটা উল্কা খসে পড়ছে। এখানে এসো। দেখে যাও।'

কিশোর মেজাজ ঠাণ্ডা রাখার জন্য শ্বাসের নীচে দশ পর্যন্ত গুনল। বাইরের আঁধারে যেই চোখ রেখেছে অমনি গাছ-পালার উপরে, আকাশে উজ্জ্বল কিছু একটা দেখতে পেল। আলোর জ্বলজ্বলে বিন্দুটা যেন মুহূর্তের জন্য ঝুলে থাকল বাতাসে, এবার এঁকেবেঁকে চলে গেল দিগন্তের দিকে, আরেকটা মুহূর্ত ভেসে থেকে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

কাছের এক ব্যুরো থেকে কিশোরের ডিজিটাল ঘড়িটা ঝলসাতে শুরু করল।

'আরি, পাওয়ার সার্জ।'

'আলোর জিনিসটা কোথায় গেল?' প্রশ্ন করল ডন।

পাগলের মতন চোখ দিয়ে আকাশে তল্লাশী চালাল কিশোর।

'কোথায় ওটা?' ডন আবারও জানতে চাইল।

'কোন প্লেনের এঞ্জিনে মনে হয় সমস্যা হয়েছে,' জোর গলায় জানাল কিশোর। 'কিংবা উল্কাও হতে পারে।'

'চলো না, কিশোর ভাই, গিয়ে দেখে আসি।'

'আমি কোন ক্র্যাশের শব্দ পাইনি। দেখার কিছু থাকলে তো যাব।'

'আমার মনে হয় না ওটা উল্কা,' জেদী কণ্ঠে বলল ডন।

বাঘা একবার ডাক ছেড়ে ওর বিছানা থেকে উঠল। জানালায় যোগ দিল ওদের সঙ্গে। লেজ সামনে-পিছনে নাড়ছে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে।

'তোর আবার কী হলো?' প্রশ্ন করল কিশোর।

বাঘা ওদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। প্রথমে কিশোরের তারপর ডনের মুখ চেটে দিল। এবার গোলাপী নেল পলিশমাখা একটা থাবা তুলে দিল জানালার শার্সির দিকে।

কিশোর এসময় লাল বিন্দুটাকে আবারও দেখতে পেল। গাছ-পালার সারির পিছনে খসে পড়ল ওটা।

লম্বা লম্বা পাইন গাছের সারির পিছনে একটা মাঠ। ভুতুড়ে লাল-কমলা আলোতে স্নান করছে।

পাজামা টপের হাতা দিয়ে জানালার শার্সি ঘষল কিশোর। বাঘার জিভের আঠা মুছে দিল। ভাল মত দেখার জন্য জানালাটা খুলল ও। এক ঝলক ধোঁয়াটে বাতাস ওকে ধাক্কা মেরে পিছিয়ে দিল কয়েক কদম। ডন নাকে-মুখে দু'হাত চাপা দিল। বাঘা গরম বাতাসের ঝাপ্টায় ডেকে উঠে চোয়াল খুলল আর বন্ধ করল।

দূরের অত্যুজ্জ্বল আলোটার দিকে চোখ পিটপিট করে চাইল কিশোর। ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে ওটা। হিরু চাচার গরু আর ঘোড়াগুলো চারণভূমি থেকে প্রবল আপত্তি জানাল।

'হিরু চাচাকে ডেকে আনো,' মৃদু কণ্ঠে বলল কিশোর।

'না, আমার ভয় করে,' নাকি সুরে বলল ডন।

এবার জ্বলন্ত আলোটা নিভে গেল পুরোপুরি। হঠাৎই চারণভূমি আর লাগোয়া মাঠ ঢাকা পড়ল নিশ্ছিদ্র আঁধারে।

কিশোর জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিয়ে আঁধারের ঘ্রাণ নিল। ধুলোর মেঘ ঢুকে গেল নাকে-মুখে। কাশতে কাশতে সরে এল ও। একটু সুস্থির হতেই দেখল বাঘা জানালা গলে বাইরে লাফিয়ে পড়েছে। 'বাঘা!' চেঁচাল কিশোর। 'ফিরে আয় বলছি।' জানালা দিয়ে যতটা সম্ভব শরীর গলিয়ে দিয়ে চিৎকার ছাড়ল, 'বাঘা!'

ঝটপট জিন্স পরে নিল ও। জানালা দিয়ে বেরিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। বাঘাকে যে করে হোক ফিরিয়ে আনবেই। বাঘা কুখ্যাত দৌড়বাজ। সুযোগ দিলে হরিণকে ধাওয়া দেবে আধ মাইল অবধি।

কিশোরের পাশে ঘাসের উপর ধুপ করে একটা শব্দ হলো। ফ্ল্যাশলাইট হাতে লাফিয়ে পড়েছে ডন। কিশোর ওর হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা ছিনিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'বাসায় যাও, ডন। তুমি ছটফট না করলে বাঘা হারাত না আর আমাকেও এই রাতের আঁধারে ওকে খুঁজতে যেতে হত না।'

ডন দু'বাহু ভাঁজ করল।

'কিশোর ভাই, তুমিই কিন্তু জানালাটা খুলেছিলে।'

এবার বনভূমির দিকে হাঁটা ধরল ডন। চু-চু শব্দ করে বাঘাকে ডাকছে।

কিশোর আড়মোড়া ভাঙল, কাশল এবং মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাইন গাছের ডাল-পালা ভেদ করে তারার ঝিকিমিকি দেখতে পাচ্ছে ও।

ডনকে ভালমানুষী করে নিজের ঘরে ঠাঁই না দিলে এখন আরামে ঘুমোতে পারত কিশোর। এই মাঝ রাতে ডন আর বাঘার পিছনে ছুটতে হত না।

ব্যাকইয়ার্ডের মেটে পথটা অনুসরণ করল ও। দেখতে পেল দোলনাটা দুলছে। গরম বাতাসের ঝাপ্টাটা নেই, তবে মৃদুমন্দ হাওয়ায়

বনভূমির কিনারে গাছের পাতার মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

মাঝ রাতে বাইরে বেরিয়ে এসে বেশ ভালই লাগছে কিশোরের। কালো গাছ-পালার পটভূমিতে হালকা রঙা দেখাচ্ছে আকাশটাকে। লাল আলোর চিহ্ন এখন আর নেই। ব্যাঙেরা উঁকি মারছে। পাইন গাছের গন্ধে রাতের বাতাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বনভূমির সমতল ট্রেইলটিতে পা রাখল কিশোর, ডন আর বাঘা যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে। থমকে দাঁড়াল পেঁচার ডাকে।

এবার গাছ-পালা ভেদ করে ম্লান লাল আভা দেখতে পেল ও। উত্তেজনা অনুভব করল। রহস্যময় আলোটা এতটাই ছোট আর স্থির যে আগুন হতে পারে না।

মুহূর্তের জন্য কিশোরের মনে হলো হিরু চাচাকে জানিয়ে আসা উচিত ছিল।

সামনের ট্রেইলে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে জগিং শুরু করল ও। অনেকটা সামনে বাঘার গলা পাচ্ছে। ডন স্রেফ উধাও।

কিশোর চিৎকার ছেড়ে ট্রেইলে তীক্ষ্ণ এক বাঁক নিল, এবং আরেকটু হলেই ডনের গায়ের উপর পড়তে যাচ্ছিল। এক গাদা পাতার উপর গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে সে। 'সরি,' বলে ওর পাশে ধপ করে বসে পড়ল কিশোর। শ্বাস ফিরে পেতে চাইছে। বাঘা কাছেই বসে হাঁফাচ্ছে। মুখে কিছু একটা ধরা। থাবা বাড়িয়ে দিল।

কিশোরের কাছ থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা কেড়ে নিল ডন। বাঘার থাবা তুলে নিল এক হাতে।

'কী যেন লেগে আছে সারা গায়ে।' ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় বাঘার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পরখ করল।

বাঘা জিনিসটা ফেলে দিল ঘাসের উপর। আলোয় চোখ পিটপিটিয়ে মৃদু 'হুফ' শব্দ করল। চেটে দিল ডনের মুখ।

ডনের পাশে ঝুঁকে বসে বাঘার পশম স্পর্শ করল কিশোর। গন্ধ নিল। এবার ঝট করে মাথা সরিয়ে কাশি দিল।

'এহ্, সিগারেটের গন্ধ!'

ডনের গলা কেঁপে গেল।

'ও কি পুড়ে গেছে?'

'না,' বলল কিশোর, তবে অতটা নিশ্চিত নয় ও। ডনকে ঘাবড়ে দিল না আরকী। বাঘার চোখজোড়া টকটকে লাল। গায়ের পশম কুঁকড়ে তারের শক্ত বৃত্তের মত দেখাচ্ছে। থাবাজোড়া ধোঁয়াটে। গায়ে হাত দিলে গরম লাগছে। কিশোর আলতো হাত বুলিয়ে ওর শরীরে ক্ষতস্থান খুঁজল। নেই।

মাটিতে হাত দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল বাঘা কী ফেলেছে, এবং কালো চকচকে আঙুলের খাপবিহীন এক দস্তানা তুলে নিল। হালকা, শক্তপোক্ত কোন কিছু দিয়ে বানানো। ওটা উল্টে দিতেই বাঘার দাঁতের দাগ দেখতে পেল।

'দেখে মনে হচ্ছে আভনে ব্যবহারের দস্তানা আর ধরে মনে হচ্ছে আবর্জনা ফেলার ব্যাগের টুকরো,' আওড়াল কিশোর। আস্তে আস্তে ভিতরে হাত ভরে সভয়ে শ্বাস চাপল। 'তিনটে আঙুল!'

কাছ থেকে দেখতে এগিয়ে এল ডন।

'গরুর দস্তানা হতে পারে,' বলল ও।

'মনে হয় না।' আলোয় ওটাকে উল্টে দিল কিশোর, সব দিক থেকে পরখ করে দেখল। এবার জিন্সের পিছনের পকেটে গুঁজে দিল।

'চলো বাড়ি ফিরি,' বলল ও।

হঠাৎই লাফিয়ে উঠল বাঘা। কিশোরের পকেট থেকে দস্তানাটা টেনে বের করল। দৌড়ে সামনে চলে গেল, পিছু ফিরে চাইল, ডাক ছাড়ল, এবং বনভূমির আরও ভিতরে ঢুকে গেল।

ডন ধাওয়া করল বাঘাকে। কিশোর ওকে অনুসরণ করল। গোলক ধাঁধার মত ট্রেইল ধরে ছুটে চলল ওরা।

'এখন সাহায্যের জন্যে চেঁচালে কেউ শুনতে পাবে না,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'ফিরে যাওয়া উচিত।'

ডনের নাগাল পেয়ে ওর বাহু চেপে ধরল।

ঝটকা দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ডন।

'আমি বাঘাকে ফেলে যাব না!'

কিশোর ওর বাহু ধরে টানল।

'আমাদের ফিরতে হবে!'

'আমাকে যেতে দাও!' চেঁচাল ডন।

'না!' অতিকষ্টে চিৎকার করা থেকে বিরত থাকল কিশোর। তার বদলে আবারও বাহু ধরে টানল।

ডন রক্তহিম করা তীক্ষ্ণ এক চিৎকার ছাড়ল। কাছের গাছ-পালা থেকে কিঁচকিঁচ করে উঠল বাদুড়ের ঝাঁক। বাহু ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে ডনের মুখ চেপে ধরল কিশোর।

এবার কীসের যেন গন্ধ পেল ও। রাসায়নিক এক গন্ধ ভেসে এসে ফাঁদের মত চেপে ধরল। কিশোরের নাক, মাথা আর গলায় যন্ত্রণা শুরু হলো। বমি করে ফেলবে আশঙ্কা হলো ওর। নাক টিপে ধরল। ডন কসরৎ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'এহ, কী বিশ্রী গন্ধ!' নাক-মুখ চাপা দিয়ে বলল ডন।

'চলো চলে যাই এখান থেকে,' বলল কিশোর।

'কেউ কি মারা গেছে?' বলতে গিয়ে কেঁপে গেল ডনের কণ্ঠ। 'কারও লাশ পচছে এখানে?'

'মনে হয় না।' গাছ-পালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখার চেষ্টা করল কিশোর। ডনের কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছে না।

'দেখো!' ফ্ল্যাশলাইটটা আকাশের দিকে তাক করল ডন।

তারা ভরা কালো আকাশে বড় চক্র কেটে মেঘ স্ক্যান করছে বিশাল এক সার্চলাইট। ভুতুড়ে, ধাতব এক গুঞ্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রাতের বাতাসে।

'বসে পড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'এখানে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে! আমাদের নাক গলানো ঠিক হবে না। চলে এসো, ডন।'

ডনকে মাটি থেকে টেনে তুলল কিশোর। ইচ্ছার বিরুদ্ধে টানাটানি করায় মনে হচ্ছে ওর ওজন যেন একশো পাউণ্ড বেড়ে গেছে। দু'সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও।

এবার দৌড়ে ঢুকে পড়ল বনভূমির গভীরে।

কিশোর ওকে চেঁচাতে শুনল, 'বাঘা, এদিকে, বাঘা,' এবং কণ্ঠস্বরটা আরও দূরে সরে যেতে লাগল। 'কোথায় তুই?'

দূরের অন্ধকার থেকে ডাক ছাড়ল বাঘা। বুঝিয়ে দিল নাগালের বাইরে রয়েছে ও।

সার্চলাইটের উপর চোখ রেখে গলা ছাড়ল কিশোর, 'ডন, চলে এসো। বাঘাকে পাওয়া যাবে না।'

ডন থামল না। ডাল-পালায় থাবড়া দিচ্ছে শব্দ পাচ্ছে কিশোর। কিশোর দৌড়ে ওর পিছু নিল। ছোট এক গাছে হাঁটু গুঁতো খেল ওর। গর্জে উঠল শ্বাসের নীচে।

সার্চলাইট ওদের মাথার উপরে বড় চক্র কেটে ঘুরছে এখন। আলোকিত করছে কাছেপিঠের গাছ-পালার মাথা।

মাথা নুইয়ে সাবধানে এগোচ্ছে ও। ক'সেকেণ্ড পরপর সার্চলাইটের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে, যাতে ধরা না পড়ে।

বাঘার ডাক কাছিয়ে এসেছে এমুহূর্তে। ওদের সঙ্গে মিলিত হতে আসছে যেন। ছোট্ট এক টুকরো ফাঁকা জমিতে এক ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাঘা। কিশোরের দু'কাঁধে থাবা তুলে দিল। দস্তানাটা ফেলে দিয়ে চাটতে লাগল ওর মুখ।

'শুয়ে পড়,' নাক-মুখ মুছে বলল কিশোর। ওর মুখের উপর ডাক ছাড়ল বাঘা। 'হয়েছে, হয়েছে, কী ব্যাপার?'

বাঘা দস্তানাটা তুলে নিয়ে হারিয়ে গেল এক ঝাড় ঝোপের মধ্যে। ক্রুদ্ধ ডাক ছাড়ছে। ওকে এভাবে কখনও গর্জাতে শোনেনি কিশোর।

সার্চলাইট নেমে এসেছে, ওদের চারপাশের মাটি স্পর্শ করেছে প্রায়।

'যাই করো, আড়ালে থাকো। সার্চলাইটে ধরা পোড়ো না,' সতর্ক করল কিশোর। 'যতক্ষণ না জানছি ওরা কারা।'

ডন ওর হাত ধরে অনুসরণ করল।

'এগুলো কি শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের?'

'জানি না। যারই হোক, বাঘা ঠিক খুঁজে বের করবে এবং ধরা পড়বে।'

'না!' জোর গলায় বলল ডন। 'বাঘা, দাঁড়া।'

মাঠের গরু আর ঘোড়াগুলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করছে। ভয়

পেয়েছে। কিশোর শিউরে উঠল।

ডন এত শক্ত করে ওকে ধরে আছে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।

'বমি-বমি লাগছে,' ফিসফিস করে বলে এক হাতে পেট চেপে ধরল।

'আমার গায়ে বমি করে দিয়ো না,' হিসিয়ে উঠল কিশোর।

'কে যেন আমাদেরকে দেখছে,' কেঁপে গিয়ে জোরাল হলো ডনের কণ্ঠ। 'কে যেন আমাকে টাচ করছে।'

'শশশ। ও কিছু না, গাছের ডাল। তুমি চেঁচাতে থাকলে আমরা ধরা পড়ে যাব, কাজেই চুপ থাকো।'

'গাছের ডাল না। কে যেন আমার হাতে আঙুল বুলাচ্ছিল।'

'কল্পনা।'

এবার কিশোর নিজেই অনুভব করল। অদ্ভুত এক অনুভূতি। কীসব যেন ওর চামড়ার উপর চলাফেরা করছে।

মাথা ভেদ করে চলে যাচ্ছে চড়া মাত্রার গুঞ্জনধ্বনি।

'আমিও টের পাচ্ছি,' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল ডন। ঠোঁট কেঁপে উঠল ওর। চোখে দেখা দিল অশ্রু।

'তুমি বাসায় চলে যাও। আমি বাঘাকে নিয়ে আসছি,' বলল কিশোর।

চোখ ঘষল ডন। শ্রাগ করল।

'তুমি বনের ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে নিয়ে ফিরতে পারবে?' সন্দেহ প্রকাশ করল কিশোর।

ডন ভ্রূ কুঁচকে শ্রাগ করল আবারও।

কিশোরের সারা শরীরে কাঁটার খোঁচা। হাত দুটো যেন পিছনমুখো হয়ে গেছে। সর্বাঙ্গে জ্বলুনি।

বাতাসে দিয়াশলাইয়ের কাঠি-পোড়া গন্ধ। বিষাক্ত কোন কিছু সম্ভবত মিশছে বাতাসে। নার্ভ গ্যাসের মতন। কেমিকেল ওয়ারফেয়ার। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত অদৃশ্য বিষ। ডন হয়তো শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের সম্পর্কে ঠিকই বলেছিল।

'আমার নাক দিয়ে পানি পড়ছে,' অভিযোগ করল ডন। 'আর খুব ক্লান্তি লাগছে। সারা শরীর আড়ষ্ট।'

'হাতা দিয়ে মোছো,' কাটখোট্টা সুরে বলল কিশোর। টের পেল ডন ছিটকে সরে গেল ওর কাছ থেকে।

হঠাৎই কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল ও। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। হাত জোড়া যেন প্লাস্টার করা, পা টুথপিকের মত সোজা।

'উঠে পড়ো, ডন! কী হলো?' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল কিশোর।

নড়ল না কিংবা একটা শব্দও উচ্চারণ করল না ডন।

'এসো, আমাদের ফিরতে হবে। তোমাকে বাসায় নিয়ে যাব কথা দিচ্ছি। বাঘা পরে পথ খুঁজে নিয়ে ফিরে আসবে। চলো যাই।'

ডন এক চুল নড়াচড়া করল না।

ওর শরীরটাকে গড়িয়ে সোজা করে দিল কিশোর। আতঙ্কে বিস্ফারিত ডনের চোখজোড়া। ওর মুখের চেহারার অভিব্যক্তি দেখে সভয়ে শ্বাস চাপল কিশোর। পিছিয়ে গেল। ডনকে স্পর্শ করার সাহস পাচ্ছে না। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। দেখে মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেহ।

রাতের বাতাস কেঁপে উঠল গরম হলকায়।

এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ওদেরকে, মনে মনে বলল কিশোর।

দুই

ডনের দু'হাত আর মুখ ঘষে দিল কিশোর। ওর আড়ষ্ট দেহে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করল। ডনের কানে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতির কথা ফিসফিস করে আওড়ে চলল কিশোর।

শেষমেশ যখন বলল ডন ওর নতুন স্পেস ক্রেটিন্স ভিডিও গেমটা পেতে পারে তখন চোখ খুলল ডন।

'কেমন আজব লাগছে,' বিড়বিড় করে বলল ও।

'তুমি তো আজবই,' বলল কিশোর।

ডন উঠে বসে চারধারে এমনভাবে চোখ বুলাল যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে।

'কী হয়েছিল আমার?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিল কিশোর, বুক ফুলে উঠল।

'তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলে। হিপনোটাইযড় হওয়ার মত।' গলা কেঁপে গেল ওর। 'আমি তো ভেবেছিলাম মারাই গেছ বুঝি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরকে দেখল ডন। ওর কথা বিশ্বাস হয়নি যেন। এবার বসে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

'শুধু মনে আছে তুমি আমাকে বাসায় যেতে বলছ।' ভ্রূ কুঁচকাল ও। 'বাঘা কোথায়? আমি এখন বাসায় যেতে চাই।'

চোখ ধাঁধানো আলো আচমকা ওদের চারপাশ আলোকিত করে তুলল।

কিশোর দু'বাহু তুলে চোখ আড়াল করল।

'ওরা মনে হয় আমাদেরকে স্পট করে ফেলেছে।'

ডনের চোখ রসগোল্লা। শিউরে উঠল।

'এসব কী?'

কিশোর লক্ষ করল ডনের হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। ওর হাঁটু চেপে ধরে কাঁপুনি বন্ধ করতে চেষ্টা করল কিশোর।

দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

সামনে স্বল্পালোকিত এক টুকরো ফাঁকা জমির দিকে আঙুল তাক করল ডন।

ডিম্বাকৃতির এক রূপালী-সাদা ডিস্ক, আকারে ছোটখাট এক বাড়ির সমান, লম্বা লম্বা চারটে পায়ে দাঁড়িয়ে ঘন-কালো ধোঁয়া ছাড়ছে। ওটার তলপেটে জ্বলছে কয়েকশো খুদে লাল বাতি।

ডিস্কটার নীচে দাঁড়িয়ে দুটো প্রাণী।

ভুতুড়ে লাল-নীল আলোয় তাদেরকে দেখে মানুষ বলেই মনে হলো। ঘাসের উপর উবু হয়ে বসে প্রাণপণে খোঁড়াখুঁড়ি করছে। ক'মিনিট পরপর প্রকাণ্ড এক বালতির মধ্যে মাটির স্তূপ ফেলছে।

ডন চেঁচানোর জন্য মুখ খুলল। কোন শব্দ বেরোল না। কিশোর

ওর মুখে হাত চাপা দিল।

বাঘার দেখা নেই, কিন্তু কিশোরের মনে হলো কাছের এক গাছের পিছন থেকে ওর কুঁই-কুঁই শব্দ পেয়েছে।

হতবিহ্বল আর আতঙ্কিত, কিশোর প্রাণী দুটোর দিকে চোখ রেখে ডনকে শান্ত করার চেষ্টা করল। সর্বাঙ্গ ধূসর ওদের, শারীরিক কোন বৈশিষ্ট্য নেই। স্রেফ ধূসর আউটলাইন। গ্যাস মুখোশের মত বড় বড় চোখ। চুল, মুখ, নাক, কান দেখা গেল না। কেবল বড় মাথা, ওরকম চোখ, খাট শরীর আর হাত-পা।

তিন আঙুলের দস্তানাটা বোধহয় ওদের কারোরই হবে। কিশোর উঁকি মেরে প্রাণী দুটোর হাত দেখল, আঙুল গোণার চেষ্টা করল, কিন্তু ও অনেক দূরে রয়েছে বলে পারল না।

হঠাৎই হাতে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করে চেঁচিয়ে উঠল ও। কী ঘটেছে বোঝার আগেই, ওর আঙুলে কামড় বসিয়ে দিয়েছে ডন।

কিশোর ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিচ্ছে, আরেকবার দাঁত বসিয়ে দিল ও। এবার কিশোর থামাতে পারার আগেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল।

ওর রক্তহিম করা আর্তচিৎকার বাঘাকে ফিরিয়ে আনল ওদের কাছে। কাঁপছে কুকুরটা। লেজ দু'পায়ের মাঝে। ডনের গায়ে লাফিয়ে উঠে মুখ চেটে দিল।

'চুপ করো!' হিসিয়ে উঠল কিশোর। আতঙ্কিত। 'এখানে কী হচ্ছে এবং ওই লোকগুলো কারা জানি না। শুধু এটুকু জানি এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে!'

ডন আজব প্রাণী দুটোর দিকে তর্জনী তাক করেছে। তারা খোঁড়াখুঁড়ি থামিয়ে গাছ-পালা ভেদ করে ওদের দিকে চেয়ে রয়েছে।

'ওরা-ওরা-কী?' তুতলে বলল ডন। ভয়ে কাঁপছে।

'জানি না, কিন্তু তোমার কারণে ওরা আমাদেরকে দেখে ফেলেছে।' কিশোর ডনের দু'কাঁধে হাত রাখল, ও যাতে একশো গজ দূরের লাল-নীল আলোটার দিকে দৌড় না দেয়।

'এখন চুপ করে শোনো আমি কী বলি। আমি বাঘার কলার চেপে

ধরব। আমরা ঘুরে দাঁড়াব, একসাথে থাকব, আর দৌড়ে বাসায় চলে যাব। বুঝতে পেরেছ?'

নাক টানল ডন। বাঘা কুঁই-কুঁই করে এক গাছের গায়ে পা তুলে দিল।

'ঠিক আছে, আমি তিন পর্যন্ত গুণব, তারপর আমরা দৌড় দেব।' বাঘার কলার চেপে ধরল কিশোর। 'গেট রেডি, গেট সেট...'

বাঘা ওর মুঠোর মধ্যে যুঝতে লাগল। ডন বাসামুখো হয়ে দাঁড়িয়ে কিশোরের সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে।

'এক...দুই...'

'হুফ!'

'বাঘা, চুপ!'

'হুফ! হুফ!'

'তিন!'

বাঘা ডাক ছেড়ে ওদের আগে ছুটল। কলার থেকে কিশোরের হাত ছুটে গেল। পিছনে ফট-ফট শব্দে ডাল ভাঙছে। ডন বাঘার পিছু পিছু ধেয়ে গেল।

'এর নাম একসাথে থাকা!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। ডন আর বাঘা হারিয়ে গেল অন্ধকার বনভূমির ভিতরে।

তিন

কিশোর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মারল প্রাণী দুটোর দিকে। ওর চেয়ে মাত্র একশো ফীট দূরে ওরা, দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে আনছে।

ওদের পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না।

'ডন, দৌড়াও!' গাছ-পালা ভেদ করে দৌড় দিল সন্ত্রস্ত কিশোর, জানে না কোন্‌দিকে যাচ্ছে, শুধু আশা করছে ডন আর বাঘাকে খুঁজে পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু ডন আর বাঘা দৃষ্টিসীমার বাইরে। হোঁচট খাচ্ছে, ডালের খোঁচায় বাহু আর মুখের চামড়া ছড়ে

যাচ্ছে, অন্ধ আতঙ্কে পতিত গুঁড়ি টপকাচ্ছে কিশোর, পানির গর্ত ভেদ করে এগোচ্ছে, ঝোপ-ঝাড়ে ধাক্কা খেয়ে নিশ্ছিদ্র আঁধারে দৌড়ে চলেছে ও।

বাহুজোড়া শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে রেখে গতি দ্বিগুণ করল কিশোর। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে, বুকের ভিতরে ধড়াস-ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। পায়ের মাংসপেশীতে খিল ধরেছে। বসে পড়তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ওদের কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্য নিজেকে টেনে নিয়ে চলল ও। আমাকে ভিনগ্রহের প্রাণীরা ধাওয়া করেছে, এরা যদি ভিনগ্রহের প্রাণী না হয় তবে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে, ভাবল কিশোর।

ঠিক ওর পিছনেই যেন কথার শব্দ পেল ও, হাঁসের মত প্যাক-প্যাক করছে। অমানুষিক শব্দের সঙ্গে ছোট ছোট বীপ।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, লক্ষ করল কিছু একটা ঘটছে ওর। যতবারই ওরা বীপ দিচ্ছে ওর ব্যথা খানিকটা কমে যাচ্ছে। কান পাতল কিশোর। পরের এবং তার পরের বীপটার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রতিটা বীপের সঙ্গে প্রশান্তি আর হালকাভাব অনুভব হলো ওর।

টের পাওয়ার আগেই, মাটির উপরে ভাসতে লাগল ও। বীপের শব্দ ক্রমেই উপরে তুলছে ওকে, প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। হাল ছেড়ে দিল কিশোর। নিজেকে ভেসে যেতে দিল। ওড়ার আনন্দ উপভোগ করতে লাগল ও। হালকা লাগছে।

হঠাৎই ঘুম পেয়ে গেল ওর। চোখ বুজল। স্বপ্ন দেখতে লাগল গাছ-পালার উপর দিয়ে, মেঘের রাজ্যে উড়ছে। সারা শরীর ভরে রয়েছে উষ্ণ, সাদা আলোয়। মাথার মধ্যে বাজনা বাজছে।

চিরকাল এমন অনুভূতি থাকলে ভাল হত, কিন্তু জোরাল, প্রলম্বিত এক 'মুউউউ!' শব্দ ওর ঘোর কাটিয়ে দিল। ঘুম-ঘুম ভাবটার বিরুদ্ধে লড়ে সচেতন হয়ে উঠল কিশোর। শব্দটা কীসের বুঝে গেছে ও। গরুগুলোর একটাকে পাকড়াও করেছে ওরা।

হঠাৎই শরীরটা ভারী হয়ে উঠল ওর। গাছের মাথা থেকে নীচের মাটিতে ধপাস করে পড়ে গেল। মাথা ঝাঁকাল ও। বুঝতে পারছে

দৌড়নো দরকার। প্রাণীগুলো এখুনি ধরে ফেলবে ওকে!

কিন্তু নড়তে পারল না কিশোর।

মাটিতে চোখ বুজে শুয়ে, শরীর কুঁকড়ে গোল করল। অপেক্ষা করছে।

কিছুই ঘটল না।

আতঙ্কিত কিশোর উঠে দাঁড়িয়ে চারধারে দৃষ্টি বুলাল। চোখ সরু করে আঁধারে উজ্জ্বল লাল ধোঁয়া দেখার চেষ্টা করল।

আজব যে প্রাণী দুটো ওকে ধাওয়া করছিল তারা এখন ফিরে যাচ্ছে।

ওদের মহাকাশযানের নীচে, লালচে আলোর মধ্যে তৃতীয় আরেকটি প্রাণী দাঁড়িয়ে, সেদিকে এগোচ্ছে ওরা। কিশোর দৌড়নোর জন্য ঘুরে দাঁড়াল। এবার লাল আলোয় অন্য একটা জিনিস চোখে পড়ল ওর।

হিরু চাচার প্রিয় গরু র‍্যাগি তৃতীয় প্রাণীটার পাশে দাঁড়ানো। এবার ভেসে ভেসে মহাকাশযানটার পেটের দিকে চলেছে। ডাক ছাড়ছে তারস্বরে।

'র‍্যাগি, না!' কিশোর অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে গরুটাকে মহাকাশযানের ভিতরে অদৃশ্য হতে দেখল। 'ওকে ছেড়ে দাও! ফিরিয়ে দাও!'

রাগে সারা শরীর কাঁপতে লাগল ওর। হাত মুঠো হয়ে গেল।

মহাকাশযানে র‍্যাগি ঢুকে যাওয়ার আগে শেষবারের মত গরুটার ক্ষীণ ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল কিশোর।

মহাকাশযানটার দিকে দৌড়ে গেল ও। পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে দু'বাহু ভর্তি বড় বড় পাথর। এবার পায়ের কাছে ফেলে দিল পাথরগুলো। তারপর একটা একটা করে তুলে নিয়ে মহাকাশযানটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল। ধাতব পাশে লেগে ছিটকে পড়তে লাগল পাথরগুলো, ওগুলো যেন রবারের বল।

মহাকাশযানটির লম্বা লম্বা রুপোলী পাগুলো গুটিয়ে যেতে শুরু করল। এবার মহাকাশযানটা ভেসে উঠে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল,

চলার পথে যেসব ছোটখাট গাছ-পালা পড়ল সেগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে দিল।

'গরুটাকে ছেড়ে দাও!' চেঁচাল কিশোর। 'তোমরা যে-ই হও, এটা প্রাইভেট প্রপার্টি!' দূরে মাঠ থেকে ডাক ছাড়ল বাদবাকি গরুর পাল।

এসময় তলপেটে মৃদু, গভীর এক আঘাত অনুভব করল কিশোর। পরমুহূর্তে নিজেকে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখল ও। বুকের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে 'হুশ' করে।

উঠে বসতে চেষ্টা করল কিশোর। প্রচণ্ড এক শক্তি ওর দু'কাঁধ চেপে ধরল।

এখন একটা সাদা রুমাল থাকলে নাড়া যেত, ভাবল ও। কাঁপা গলায় নিজেকে বলতে শুনল, 'গুলি করবেন না। আমি সারেণ্ডার করছি।'

প্রবল শক্তিটার বিরুদ্ধে যুঝে চলল ও। কিন্তু বাধা দেয়া বন্ধ করতেই আবারও ওর দেহ ভেসে উঠল বাতাসে।

কী ঘটছে এসব?

পা ছুঁড়ছে কিশোর। থাবা দিয়ে গাছের ডাল ধরতে চাইছে। আকাশে ভাসছে ও, গোটা শহরের মিটমিটে আলোগুলো ওকে বড়দিনের আলোকসজ্জার কথা মনে করিয়ে দিল।

নার্ভ গ্যাস কি মানুষকে উড়তে সাহায্য করে?

নিজের বিদঘুটে অবস্থা চোখে পানি এনে দিল কিশোরের। আচ্ছা, আমি কি মরে গেছি? বেহেশতে চলে গেছি? ভাবল ও।

এভাবে কতক্ষণ ভাসবে সে? একটা সময় তো মাটিতে আছড়ে পড়তেই হবে। একটা হাড়ও কি আস্ত থাকবে?

গড়িয়ে, ভেসে, সাঁতার কেটে ওর দেহ বাতাস কেটে মহাকাশযানটার দিকে এগিয়ে চলেছে। দিক পাল্টানোর ক্ষমতা নেই কিশোরের। চুম্বকের মত টানছে ওকে। ভাসতে ভাসতে মহাকাশযানটার গোল জানালাগুলোর বরাবরে চলে এল ও। ভিতরে উঁকি দিতেই দেখতে পেল একটা প্রাণী লম্বা এক টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে। কামরাটাকে হাসপাতালের অপারেটিং রূমের মত দেখাচ্ছে।

পরমুহূর্তে, কয়েক ফীট নেমে গেল কিশোর। ধূসর, ধাতব দেয়ালের সামনে এখন ও। হাত বাড়াল স্পর্শ করার জন্য। কিন্তু ওটা যেন সরে গেল। ও অবশ্য দেখেনি ওটাকে সরতে।

কিশোরের মাথার ভিতরে গুনগুন শুরু হয়েছে। প্রথমে মৃদু, তারপর জোরাল। শব্দের চোটে ব্যথা করতে লাগল। গুঞ্জনধ্বনি আর রবার পোড়ার উৎকট গন্ধে বমি ঠেলে উঠতে চাইল ওর।

এখনও বাতাসে ভেসে রয়েছে ও।

ব্যাপারটা বাতাস নয়, ভাবল কিশোর।

শরীর শক্ত করল ও, তৈরি হলো মাটিতে পড়ার জন্য। নীচের দিকে সাঁ-সাঁ করে নেমে যেতে লাগল, কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, মাথার উপরের তারাগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে।

হাড় ভাঙার শব্দ শুনবে আশঙ্কা করল কিশোর। অপেক্ষা করছে পতনের কান ফাটানো আওয়াজ শোনার জন্য।

ঘটনাটা ঘটল না।

উপলব্ধি করল ও আর নড়ছে না। বিনা ব্যথায় মাটিতে নেমেছে। মাটি, উদ্ভিদ আর পাথুরে জমি অনুভব করল। উঠে দাঁড়াল। হাঁটুতে জোর নেই, বমি আসছে। টলতে টলতে হেঁটে সরে যেতে চেষ্টা করল।

হঠাৎই ঘূর্ণি বাতাস ওকে শূন্যে তুলে নিয়ে গেল। ঢুকিয়ে দিল মহাকাশযানের ভিতরে।

চার

ভিতরের আজব আঁধার ওকে অসাড় করে দিল।

ঝাড়া দিয়ে সরতে গিয়ে পড়ে গেল। ওর মাথা স্পর্শ করল শীতল, নরম এক মেঝে।

আঁধার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আর কিছু নেই।

অন্ধ হয়ে গেছে কিনা ভাবল ও। কিন্তু চোখ সয়ে আসতেই দেখতে পেল এক দল কালো, আবছা ছায়া। এখুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর

উপর। এত আঁধার কেন এখানে, ভাবল ও, এরা কি ওর মগজ ধোলাই করবে?

জোরাল, ধাতব এক শব্দ শুরু হলো, এবং অন্ধকারটা কাঁপতে লাগল। শব্দটা ওকে কোন দানব ডেন্টিস্টের ড্রিলের কথা মনে করিয়ে দিল। কুঁকড়ে গোল হয়ে, চোখ বুজল ও। আপাদমস্তক কাঁপছে।

কামরাটা হঠাৎই চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরে উঠল। সামনে কিছু একটার উপস্থিতি টের পেল কিশোর। এক চোখ মেলল। দেখতে পেল বিরাট এক হাঁসের পা।

এক প্রাণী কিশোরের সামনে দাঁড়িয়ে। আকারে ওর সমানই হবে, কিন্তু কিশোরের মনে হলো এটা পৃথিবীর যে কোন দানবের চাইতে বিশাল।

গভীর শ্বাস টানল ও। এবার ক্রুদ্ধ সিংহের মতন লাফিয়ে উঠে গর্জন ছাড়ল। দু'হাতে ঘুষি চালাল প্রাণীটার উদ্দেশে।

'শত্রুদের গুপ্তচর!' চেঁচিয়ে উঠল।

তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে লাফিয়ে পিছাল প্রাণীটা। ওটার তিন-আঙুলের হাত কিশোরের কাঁধ চেপে ধরল, কিন্তু ও কিছুই অনুভব করল না।

'আমাকে যেতে দাও! আর গরুটাকেও! আমাদের যেতে দাও, প্লিজ!'

প্রাণীটার মস্ত কালো, তেরছা চোখ দেখতে পেল ও। হঠাৎই নিজেকে কোণঠাসা অনুভব করল। ঠিক গত সপ্তাহে ধরা খরগোশটার মত। ছোট্ট, পাতলা এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ওটা, নিজেকে নিরাপদ ভাবছিল। কিশোর ওটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর রেড সক্স ক্যাপটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, এবং পরে আবার ছেড়ে দেয়। এই প্রাণীটাও হয়তো ওকে যেতে দেবে।

ওটা কি ওকে কিছু বলতে চাইছে? প্রাণীটার মুখে কিছু একটা নড়তে দেখল ও। পাতলা ঠোঁট জোড়া চোখে পড়ে শুধুমাত্র ওগুলো নড়াচড়া করলে।

ওটা ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। কিশোর যেন অনুভব করল ওকে বলছে, 'এখানে থাকো। নোড়ো না।'

হঠাৎই ওর নিজের কথাগুলো মাথার ভিতরে বাড়ি খেল। আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে! এখুনি!

প্রাণীটার চোখের দিকে দৃষ্টি স্থির করল কিশোর। এরকম চোখ আগে কখনও দেখেনি ও। তেরছা আকার এখন গোল রূপ নিয়েছে।

চোখজোড়া আচমকা ওর মাথার ভিতরে ঢুকে গেল!

এটা একটা স্বপ্ন। আমি জেগে উঠব। প্লিজ, আমার ঘুম ভাঙিয়ে দাও।

যদি স্বপ্ন না হয়, তবে এরা কারা? এরা কি মহাকাশের বোম্বেটে? এরা র‍্যাগিকে চুরি করেছে। ওর কাছে কী চায়? ওর কাছে তো কোন টাকা-পয়সা নেই। কিছুই নেই। কী চাইতে পারে এরা? প্রাণীটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ও।

চোখজোড়া স্থির, ওকে যেমন আছে তেমনি ভাবে থাকতে বলছে। চোখজোড়া কথা বলছে ওর সঙ্গে। এগুলো এমন একজোড়া চোখ যারা কথা বলে, মাথার ভিতরে আঘাত করে–অথচ শরীরের সঙ্গে যেন এদের কোন সম্পর্ক নেই। এরা যেন স্রেফ একজোড়া চোখ।

এবার কিশোর সিদ্ধান্তে পৌঁছল এই প্রাণীগুলো কারা: গোপন মিশনে এয়ার ফোর্স টেস্ট পাইলট, এতটাই গোপন এদের কাজ-কর্ম যে এমন ইউনিফর্ম পরে, যেখানে শুধু চোখ দেখা যায়। ওর হয়তো ভয় না পেলেও চলে।

কিন্তু তবুও ও ভয় পাচ্ছে!

চোখজোড়া ওর চোখের উপরে স্থির হলো। এক্স-রের মত যেন ভিতরটা দেখে নিচ্ছে। কিশোর নিশ্চিত ওকে হাড়-মাংসের স্তূপে পরিণত করার ক্ষমতা রয়েছে এদের, ওর ভিতরটা চাইলেই পুড়িয়ে দিতে পারে।

চোখজোড়া বিদ্ধ করছে ওকে, ভাসছে বন্দি কিশোর।

ওর মনের উপর প্রভাব খাটাচ্ছে ও দুটো।

বাসায় যেতে চায় ও।

যদি না পারে? আর যদি কখনোই বাড়ি ফেরা না হয়? ওকে নিয়ে যদি অন্য কোন জগতে চলে যায়?

'আমি বাড়ি যেতে চাই।' শেষমেশ কথা খুঁজে পেয়ে প্রাণীটার উদ্দেশে বলল কিশোর।

চোখ সরিয়ে নিল প্রাণীটা। মাথাটা এমনভাবে কাত করল যেন কিশোরের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছে। দীর্ঘক্ষণ ওটা কিশোরের দিকে চেয়ে রইল। ওটার দৃষ্টির সামনে পুরোপুরি অসাড় হয়ে পড়ল ও।

প্রাণীটা এবার কিশোরকে নড়াতে চেষ্টা করল।

ওটার হাতজোড়া যদিও কিশোরের গায়ে, কিন্তু ও কোন চাপ অনুভব করল না। প্রাণীটার ছোঁয়ায় যেন ওর দেহ ভাসছে। কিশোর যদিও শরীর মোচড়াচ্ছে, বাধা দিচ্ছে মেঝেতে পা ঠেকিয়ে, তারপরও এই ভিনগ্রহের জীবটা ওকে টেনে নিয়ে চলেছে।

ধাতব এক চেয়ারে ওকে বসাল ওটা। চেয়ারের হাতল আর সামনের পায়া থেকে চামড়ার স্ট্র্যাপ ঝুলছে।

'খোদা, এটা যেন স্বপ্ন হয়,' জোর গলায় প্রার্থনা জানাল কিশোর।

প্রাণীটাকে হতচকিত দেখাল। কিশোরের মাথার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে, চোখে চোখে চাইল।

কিশোর অপেক্ষা করছে।

এবার ওটা ওর হাত-পা বেঁধে ফেলল।

কিশোর ঠিক করল চোখ বুজে রাখবে। বারবার নিজেকে চোখ বন্ধ রাখার কথা মনে করিয়ে দিল।

ও এখন শক্তিহীন, চেয়ারে বাঁধা। কিশোর জানে জীবটা এখনও ওখানে রয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ সব কিছু অন্ধকার, এবং ওর চোখ বোজা, বিশ্বাস করার দরকার নেই ওটা আছে।

ওর কোন কিছুই বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। ও বরং ভাবতে পারে অন্য কোথাও রয়েছে।

কল্পনা করল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটছে ও, র‍্যাগিকে নিরাপদে চারণভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। গেট খুলল, র‍্যাগির দু'চোখের মাঝখানে প্রিয় জায়গাটায় চুলকে দিল, তারপর পিছনে থাবড়া দিয়ে গেট বন্ধ করে দিল। এবার বাড়ির পথ ধরল। নিজের কামরার কথা

ভাবল কিশোর। বাঘা ওখানে গোলাপী নখ নিয়ে অপেক্ষা করছে। নাস্তায় হুইপড্ ক্রিম দিয়ে চকোলেট চিপ প্যানকেক খাবে ও। সঙ্গে কমলার রসের বদলে কোলা। সারা দিন স্পেস ক্রেটিন্স খেলবে, প্রতিটা গেম জিতবে।

এবার উপলব্ধি করল প্রাণীটা ওর পাশে দাঁড়িয়ে। অনুভব করছে ওটা ওকে ধরে রেখেছে, যদিও টের পাচ্ছে না। ওর স্রেফ মনে হচ্ছে ও আবারও বাতাসে ভেসে রয়েছে।

হঠাৎই ওটাকে দেখতে চাইল কিশোর।

চোখ সামান্য খুলল ও, নেই।

চারপাশে নীল আলো চমকাচ্ছে। চোখ পিটপিট করে চাইল কিশোর। ছোট্ট এক নীলরঙা হাসপাতালের কামরায় রয়েছে সে। অপারেটিং টেবিল, ইউটেনসিল্স, এবং দেয়াল লাগোয়া আজব সব যন্ত্রপাতি ঘিরে রেখেছে ওকে। সব কিছু ঝকঝকে তকতকে। গোলাকার ঘরটায় একটামাত্র ছোট্ট জানালা।

এখনও স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা কিশোর। কিনারা দিয়ে পা জোড়া দুলছে।

চোখ বুজল ও।

'আমাকে ছেড়ে দাও!' গোলাকার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো ওর চিৎকার।

পেটের ভিতরটা গুলোচ্ছে ওর। কিন্তু বমি করবে কোথায়? গুঙিয়ে উঠল।

ছাদের দিকে চাইতেই, ছোট্ট এক ভিউয়িং স্ক্রীন চোখে পড়ল, অনেকটা টিভি মনিটরের মত। ওতে দেখতে পেল ছোট, চারকোনা এক ঘরে শিকল দিয়ে বাঁধা র‍্যাগি। মাথা নিচু করে একাকী দাঁড়িয়ে, মেঝে শুঁকছে।

কিশোর চেঁচিয়ে উঠল যদি র‍্যাগি শুনতে পায়।

'আমি এখানে, র‍্যাগি।'

স্ট্র্যাপ টেনেটুনে হাত মুক্ত করতে চেষ্টা করল। এক মুঠো চিনি থাকলে, ওর ধারণা, র‍্যাগিকে মহাকাশযান থেকে বের করে মাঠে নিয়ে

যেতে পারত। র‍্যাগিকে ক্ষণিকের জন্য মাথা তুলে আবার নুইয়ে ফেলতে দেখল ও।

চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ভয় পাস না। ওরা স্রেফ তামাশা করছে। এরা মার্শিয়ানদের পোশাক পরা টেস্ট পাইলট। ওদের টপ সিক্রেট মিশন শেষ হয়ে গেলেই আমরা বাড়ি ফিরে যাব।'

মুহূর্তের জন্য কথাগুলো প্রায় বিশ্বাস করে ফেলল ও।

র‍্যাগি ওর গলা শুনতে পাচ্ছে না। ওর ছবি উধাও। কিশোর টেবিলে ঘুষি মারল। হতাশ। চোখ পিটপিট করে পর্দার দিকে চাইল, কিন্তু র‍্যাগিকে আর দেখা গেল না।

পাঁচ

দুটো জীব ওর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কথা বলছে ক্যা-ক্যা করে।

প্রকাণ্ড খুলি, বেঢপ মাথা ওদের। সরু চিবুক। পটলচেরা চোখজোড়া পৌঁছে গেছে মাথার দুপাশ অবধি। কিশোরের মনে হলো এরা বোধহয় চারপাশের সব কিছু দেখতে পায়। এদের গায়ের চামড়া নীলচে-ধূসর, মাথায় চুল নেই।

চলাফেরায় আড়ষ্ট ভাব—রোবটের মত।

একটা প্রাণী কিশোরের হাতা গুটিয়ে দিল, এবং অন্য দুটো ওর বাহুর দিকে চেয়ে রইল। এবার কৌতূহলী চোখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। বড় লেন্সওয়ালা এক যন্ত্র টেনে এনে ওর বাহুর একটা ছবি নিল।

ক্যা-ক্যা করে তখনও পরস্পরের সঙ্গে বকে চলেছে, পালা করে যন্ত্রের ভিতরে উঁকি দিচ্ছে ওরা। একটা প্রাণী যন্ত্রটা ঘুরিয়ে নিজের বাহুর উপর ফোকাস করল। উঁকি দিয়ে দেখে ফের কিশোরের বাহুর দিকে ধরল, দু'জনের চামড়ার তুলনা করছে যেন।

কালো এক দস্তানা পরল প্রাণীটা, বাঘা যেমনটা খুঁজে পেয়েছিল। এবার আসল আতঙ্ক শুরু হলো।

কোত্থেকে যেন ছুরিসদৃশ এক যন্ত্র এসে গেল।

'ওটা নিয়ে আমার কাছে আসবেন না!' আর্তনাদ ছাড়ল কিশোর।

প্রাণীটা উপেক্ষা করল ওকে, যেন বোঝেনি কিংবা শুনতে পায়নি। ওর বাহু থেকে চামড়া তুলে নিল ছুরিটা। প্রাণীটা চামড়ার টুকরোটা স্বচ্ছ এক প্লাস্টিকের স্লাইডে রাখল। এবার ওটা গুটিয়ে রেখে দিল ড্রয়ারে।

ঘরের আলো আচমকা পাল্টে গিয়ে কমলা, হলদে, আর সাদা হয়ে গেল। প্রাণী দুটো কিশোরের বাঁধন খুলে দিয়ে ওকে ক্রিস্টালের প্রকাণ্ড এক স্ল্যাবে রাখল। ও ভেবেছিল বরফের মত ঠাণ্ডা হবে বুঝি, কিন্তু জিনিসটা উষ্ণ।

এবার লম্বা, পাতলা এক ক্রিস্টালের টিউব ওর মাথার উপরে বাতাসে দুলানো হলো। একটা প্রাণী কিশোরের বুকে আলো ফেলল। আলোর রশ্মিটা কড়-কড় করে শব্দ করল।

'কী করছেন আমার সাথে?' কিশোর চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি বাসায় যাব!'

আলোটা সুঁইয়ের মতন বিঁধল! আলো যেখানটা স্পর্শ করছে সেখানটা চুলকোতে ইচ্ছে করছে। জায়গাটা ভয়ানক চুলকোচ্ছে, সে সঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে যেন। হঠাৎই ওর গোটা দেহ ফুলে শক্ত হয়ে গেল, চামড়া ফেটে বেরিয়ে যাবে যেন।

ঘরটা সহসা আঁধার হয়ে গেল।

কিন্তু কিছু একটা আভা ছড়াচ্ছে। সেই কিছু একটা হচ্ছে ও! চোখ নামিয়ে নিজের শরীরের দিকে চাইল কিশোর। দেখতে পেল উজ্জ্বল লাল আলোয় আলোকিত ওর গোটা কঙ্কাল। হ্যালোউইন কস্টিউমের মত চমকাচ্ছে ওর হাড়গুলো।

গলা ফাটিয়ে আর্তচিৎকার ছাড়ল কিশোর।

ওর আর্তনাদে যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল প্রাণীগুলো। সবকটা আলো জ্বলে উঠল এবং বিভ্রান্ত জীবগুলো ক্যা-ক্যা করে কীসব বলাবলি করতে লাগল। কিন্তু ওরা সুঁইটা বন্ধ করল না। কিশোরের শরীরে মৌমাছির হুলের মত বিঁধছে ওটা।

'বন্ধ করুন! বন্ধ করুন!' চেঁচাল ও। ক্রিস্টাল টেবিলে আটকানো ওর দেহ। সুঁইটার কাছ থেকে শরীর মুচড়ে সরে যেতে পারছে না। 'আমাকে ছেড়ে দিন! যেতে দিন!'

মাথাটা ভারী ঠেকছে কিশোরের, ওটা যেন তুলো দিয়ে ঠাসা। চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভয়ঙ্কর সেই ভাবনাগুলো বারবার ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। ডন কোথায়? ও ভাল আছে তো? বাঘা কেমন আছে! আমার উচিত ছিল ওদের সঙ্গে থাকা। তা হলে ওদেরকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারতাম। আমি কি আদৌ আর বাড়ি ফিরতে পারব? আর কখনও কি চাচা-চাচী, প্রিয় বন্ধু-বান্ধবদের দেখতে পাব?

এবার একটা প্রাণী নিজের এক গোছা চুল কেটে, মুড়ে রেখে দিল।

কিশোরের স্নিকার্স খুলে নিয়ে ওর পায়ের পাতার দিকে চাইল ওরা।

চোখ বুজে রাখল কিশোর।

একটা প্রাণী কিছু একটা দিয়ে কিশোরের পায়ের নখ কাটল, তারপর দুটোয় মিলে ওর পায়ের পাতায় হাত বুলোতে লাগল।

একজন ওর পাজামা শার্টের বোতাম খুলল। ছোট ছোট অনেকগুলো সূচের খোঁচা অনুভব করল কিশোর। বুকে বেড়ালের নখরের মতন আঁচড় কাটছে।

'কী করছেন আপনারা?' অতিকষ্টে কান্না চাপল কিশোর। ও কাঁদতে চায় না বাচ্চাদের মত। কিন্তু ওর সঙ্গে কেন এসব করা হচ্ছে বুঝতে পারছে না।

এবার তৃতীয় আরেকটি প্রাণী যোগ দিল বাকি দু'জনের সঙ্গে। আগন্তুক ওকে পরখ করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সামনে এগিয়ে এসে কিশোরের বুকের উপর হাত দোলাল। হুল বেঁধানো জ্বালা দূর হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য স্বস্তি অনুভব করল কিশোর। ব্যথা দূর করে দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করল প্রাণীটার প্রতি। এই প্রাণীটা অন্যদের চাইতে সামান্য অন্যরকম। প্রায় ইঞ্চি ছয়েক খাট আর

লিকলিকে। এটা বাচ্চা কিনা ভাবল কিশোর। আজব এই মিশনে এরা কি নিজেদের ছেলেপিলেদেরও নিয়ে এসেছে?

এবার প্রাণীটা কথা বলল ওর মগজের ভিতরে।

'ভয় পেয়ো না।'

হঠাৎই গোটা শরীরে উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল কিশোরের। প্রাণীটার হাত ঝাঁকিয়ে দিতে চাইল ও। বাহু তুলল। অন্যদের দিকে চাইল প্রাণীটা। পিছন ফিরে কিছু একটা নিয়ে আলোচনায় মশগুল তারা। মুহূর্তের দ্বিধার পর, কিশোরের হাত শক্ত করে চেপে ধরল ওটা।

কিশোর মৃদু হেসে ওটার চোখের দিকে চাইল। আশা করছে ওর চোখে চোখে তাকাবে প্রাণীটা।

'আপনি কে? আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল ও।

এক্স-রে বিদ্ধ করছে এমন অনুভূতি হবে আশা করেছিল কিশোর, কিন্তু তার বদলে উপর থেকে ওটার চোখে ধূসর, বাদামি এবং ম্লান নীলের আজব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পেল, সঙ্গে ছড়ানো ছিটানো ধাতব কাঠামো। ভূচিত্রটা একেবারে সমতল এবং দিগন্ত সূর্যবিহীন ধুলোটে ধূসর।

অচেনা কোন গ্রহ? কিংবা ভবিষ্যতের পৃথিবী?

কিশোরের মনের মধ্যে একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'পৃথিবীতে আমার নাম জোসিয়া। তুমি কি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে কিছু জানো?'

কিশোর ক্লাসে পড়া ভূগোলের জ্ঞান মনে করার চেষ্টা করল।

'না, শুধু এটা জানি সূর্য হচ্ছে সৌরজগতের সেন্টার। নয়টা গ্রহ আছে। আর লক্ষ-লক্ষ তারা।'

প্রাণীটা অদ্ভুত শব্দ করল। কিশোর অনুমান করল, হাসছে।

কামরার অন্য প্রাণী দুটো জোসিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্য-ক্য করতে লাগল। জোসিয়া টেবিলের কাছ থেকে সরে যেতেই কিশোরের উষ্ণ অনুভূতিটা কমে এল।

ওই প্রাণী দুটোর মধ্যে এমন কিছু আছে কিশোরকে যা সাঙ্ঘাতিক ভাবে সন্ত্রস্ত করছে। ওরা জোসিয়ার চাইতে আলাদা। চেহারায়, কথা-

বার্তায়। ওদের চোখজোড়া শূন্য। দেখে মনে হয় কোন অনুভূতি নেই। কিশোর ওদের কাছে নিজেকে মোটেই নিরাপদ ভাবতে পারছে না।

'আপনারা কারা?' চেঁচাল ও। 'কী চান?'

বড় প্রাণী দুটো খুদে খুদে হাত দিয়ে কান ঢাকল। কিশোরের চেঁচামেচি কানে লাগছে যেন। মুহূর্তখানেক দুটো মাথা এক করে ক্য-ক্য করল জোসিয়ার উদ্দেশে, তারপর ঘর ত্যাগ করল। জোসিয়া রয়ে গেল।

কিশোরের বুকে ঠাণ্ডা লাগছে। স্ট্র্যাপের বাঁধনে বন্দি, পাজামা শার্টের বোতাম লাগানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল ও।

দেয়ালের এক ফোকরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ম্যাপ বের করল জোসিয়া। ওটা লম্বার চাইতে চওড়ায় অনেক বেশি। অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুতে ভর্তি। কিছু কিছু পিন পয়েন্ট করা এবং অন্যগুলো বড় কোয়ার্টার। বাঁকা লাইন আর গোল দাগ বিন্দুগুলোকে জুড়ে দিয়েছে। জোসিয়া এক গুচ্ছ ডটেড লাইনের দিকে আঙুল তাক করল।

'আপনারা কি এভাবেই আপনাদের টপ সিক্রেট এয়ার বেসে পৌছান?' কিশোর প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল জোসিয়া।

'না, এটা তোমাদের কাছে পৌছনোর রুট।'

'কোথা থেকে? আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?'

'ক্যাব্রিয়ান।'

'কোন্ গ্রহ?'

'দূরের এক তারা।'

হুঁ, এটা যদি খেলা হয় তবে কোন উপায় নেই, ওকেও খেলে যেতে হবে।

'আপনার বয়স কত?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'বয়স কী?'

'কত বছর? মানে আপনার বয়স...' শ্রাগ করল কিশোর, কীভাবে বোঝাবে বুঝতে পারল না।

'কত বছর?' জোসিয়া প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করে নিজেকে শোনাল।

'সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর ঘোরার সাথে এর সম্পর্ক আছে।' ঘড়ি পরা হাতটা ঝাঁকাল কিশোর। 'এতে সময় ওঠে—সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, সেখান থেকেই বছর পুরোয়।'

জোসিয়াকে দেখে মনে হলো কিছুই বোঝেনি।

কিশোর ওর দিকে মুহূর্তখানেক চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কী? আপনি কি ভবিষ্যৎ থেকে এসেছেন? নাকি মঙ্গলগ্রহের লোক? আর আপনি আমাদের গরুটাকে নিলেন কেন?'

জোসিয়া একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

'খাওয়ার জন্য। তোমরা গরু খাও না?' টাক মাথা চুলকাল ও।

'না, ও খাওয়ার জন্য নয়। ও আমার বন্ধু।'

'বন্ধু।'

'ও আমার এখানে আছে।' হৃৎপিণ্ডের দিকে হাত বাড়াতে চাইল কিশোর, কিন্তু স্ট্র্যাপের জন্য পারল না।

জোসিয়া কিশোরের বুক স্পর্শ করল।

'এখানে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

জোসিয়া হঠাৎই ওর তিন-আঙুলে হাতটা সরিয়ে নিল।

'হাত রাখতে পারেন, কোন অসুবিধে নেই,' বলল কিশোর।

'তোমার দুশ্চিন্তাগুলোও কি ওখানে আছে?' জোসিয়ার প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল কিশোর।

'তা হলে কোথায়?'

জোসিয়ার হাতে নিজের মাথা ছোঁয়াল কিশোর।

'এখানে। সব দুশ্চিন্তা আছে আমার মাথায়।'

জোসিয়ার পাতলা ঠোঁটজোড়া 'o' হয়ে গেল।

'এতবড় জিনিসটার ভিতরে নিশ্চয়ই অনেক দুশ্চিন্তা আছে।'

হেসে ফেলল কিশোর।

'এখান থেকে বেরোতে না পারার জন্য আমি চিন্তিত,' বলল ও। গড়গড় করে কথা বেরিয়ে আসতে লাগল। 'বেরোতে পারলেও চিন্তা।' শ্বাস নিল কিশোর। হঠাৎই উত্তেজিত বোধ করছে। 'আমি এখান থেকে

বেরিয়ে গেলেও কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না আমি আপনাকে দেখেছি, এখানে এসেছি। আপনারা আমার সাথে কেন এমন করছেন? সবাই আমাকে পাগল ভাববে।'

'না, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব।'

'কী বলছেন? অসম্ভব! কে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'ওই দু'জন। আমরা সবাই ক্যাব্রিয়ান। আমাদেরকে নমুনা নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'বুঝলাম না।' কিশোর চিত হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে রইল। ও যা ভাবছে তা যেন সত্যি না হয়, আশা করছে। চাপা স্বরে বলল, 'ওরা যেন আমাকে ছেড়ে দেয় আপনি সে ব্যবস্থা করতে পারেন না?'

'আমি হাইব্রিড। আমার কোন ক্ষমতা নেই।'

'হাইব্রিড?' মেরি চাচীর বাগানের ফুলগুলোর কথা ভাবল কিশোর। দুটো আলাদা ধরন মিশিয়ে যেগুলো বানানো হয়। চাচী বলেন ওগুলো হাইব্রিড। জোসিয়াও কি কোন ধরনের মিশ্রণ?

'কী বলছেন? অন্য দু'জনের চাইতে আপনার ক্ষমতা বেশি, আপনি আমার সাথে কথা বলতে পারছেন, ওরা পারে না। আপনি ভাল, ওরা খারাপ।'

'আমি তুচ্ছ, কারণ আমি অর্ধেক ক্যাব্রিয়ান। এবং বাকিটা মানুষ।'

কিশোর চোখ পিট পিট করল। মুখ হাঁ।

'আমরা সব হাইব্রিডই তুচ্ছ। স্রেফ খোলের মতন। আমরা শুধু কাজ করি। আমাদের কোন দাম নেই।'

'না। ক্যাব্রিয়ানরা হয়তো তা-ই বলে আপনাদেরকে। কিন্তু আপনারা অন্যরকম। আপনারা ভাল।'

চোখের তারা ম্লান হয়ে এল জোসিয়ার।

'ক্যাব্রিয়ানরা মুমূর্ষু জাতি। মানুষের হৃদয় আছে। নিজেদের জাতকে বাঁচিয়ে রাখতে ক্যাব্রিয়ানদের আরও শক্তি চাই। কিন্তু শুধুমাত্র সত্যিকারের ক্যাব্রিয়ানদেরই ক্ষমতা আছে।'

'আপনারা মানুষ চুরি করছেন কেন? আমাকে বাড়ি যেতে দিচ্ছেন না কেন?' নিজেকে বায়োলজি ক্লাসের সংরক্ষিত ব্যাঙের মত লাগছে

কিশোরের। 'এটা স্রেফ পাগলামি। আপনারা এভাবে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন না। আমি জাদুকরের খরগোশের মত হাওয়া হয়ে যেতে পারি না। চাচা-চাচী আমাকে মিস করবে।'

'হ্যাঁ, পৃথিবীতে অনেক মানুষের কাছে তোমার দাম আছে। তুমি তুচ্ছ নও,' বলল জোসিয়া।

'সেজন্যেই আমার বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। আমার ওখানে প্রয়োজন আছে, এখানে নয়। কিন্তু এই স্ট্র্যাপগুলো খুলে না দিলে আমি তো এই টেবিল থেকেও নামতে পারছি না।'

'তুমি লড়াই করবে,' জোসিয়ার কণ্ঠে প্রশংসার ইঙ্গিত।

জোসিয়ার কথাগুলো অবাক করল কিশোরকে। এক মুহূর্ত ভাবল ও।

'কীভাবে লড়ব আমি? ওরা দু'জন, সাথে আপনি। আর আমি একা। আপনি মন ব্যবহার করে আমাকে নড়াতে পারেন, আমার বিরুদ্ধে কেমিকেল যুদ্ধ করতে পারেন, এবং আমি ওদের মারতে গেলে অন্যরা ঠেকাবে।'

কিশোরের হাতের উপর একটা হাত রাখল জোসিয়া। কিশোর আলতো করে ওর ধূসর চামড়া স্পর্শ করল। প্লাস্টিকের মত লাগল ওর কাছে। চামড়াটা শক্ত। আঙুলের ডগাগুলো দৃঢ়।

কিশোর জোসিয়ার শরীরের চামড়ার দিকে চাইল। ঢিলে আর জায়গায় জায়গায় ভাঁজ পড়া। জোসিয়ার বুক বলিষ্ঠ, অন্যদের মত সোজা আর সরু না। দেখে মনে হয় শরীরে শক্তি রাখে। ওর তা হলে শক্তি নেই কেন?

হঠাৎই চিন্তাটা মাথায় খেলে গেল কিশোরের। শক্তির ভিন্নতা রয়েছে। শরীরের এবং মনের শক্তি। জোসিয়া যা-ই বলে থাকুক, সত্যিকারের ক্যাব্রিয়ানদের সম্ভবত কোনটাই নেই। ওদের একমাত্র শক্তি অগ্রসর কারিগরি বিদ্যা।

কিশোর ওদের উপর নিজের জোর এখনও খাটায়নি, বিশেষ করে মনের জোর। ওর শরীরকে বন্দি করেছে ওরা, মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ওর পক্ষে কি আদৌ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে?

এই অবস্থায় ও যদি সমস্ত মনের জোর জড় করে, ওর শারীরিক শক্তি হয়তোবা ক্যাব্রিয়ানদেরকে সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে, ওরা যেটার সঙ্গে আগে হয়তো পরিচিত ছিল না।

'আপনি আমাকে পালাতে সাহায্য করতে পারেন,' বলল কিশোর। 'এবং আমি যখন চলে যাব তখন আপনি অনুভব করবেন আপনিও কিছু একটা—তুচ্ছ নন। এবং এ-ও জানবেন কোত্থেকে সত্যিকারের ক্ষমতা আসে!'

ছয়

'আপনি ভাবেন আপনার কোন ক্ষমতা নেই। ওরা এটা আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে, আপনার ওপর যাতে প্রভাব খাটাতে পারে,' বলল কিশোর। ওর ধারণা ক্যাব্রিয়ানরা জোসিয়াকে চাকরের মত খাটায়।

জোসিয়ার চোখজোড়া জ্বলে উঠল। কাঁধ সোজা হলো এবং তীক্ষ্ণ চিবুকটা সামান্য কাত হলো।

'আপনি আপনার ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাকে পালাতে সাহায্য করতে পারেন। আমরা দু'জন ওদের বিরুদ্ধে একসাথে মাথা খাটাতে পারি। সেক্ষেত্রে, এই শিপটা রওনা হওয়ার আগেই আমি পালাতে পারব।' জোসিয়ার মধ্যে কোন ভাবান্তর হয় কিনা দেখল কিশোর, কিন্তু ক্যাব্রিয়ানটা নিথর দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখের চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই।

হঠাৎই প্রাণীটা চারধারে নজর বুলাল। দেয়ালে বাঁধা দু'সেট বেল্ট আর হাতলের উপর দৃষ্টি স্থির হলো ওর। মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত মনে হলো ওকে। এবার জোরালো চড়া এক গর্জনে কেঁপে উঠল কামরাটা। বোমা ফাটার শব্দে দুলে উঠল টেবিলটা। কিশোর টেবিলটার কোনা চেপে ধরল, ওকে নিয়ে যাতে উল্টে না পড়ে।

যান্ত্রিক কণ্ঠে জোসিয়া উচ্চারণ করল, 'আমাদের এখন রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে।'

'না! আমাকে যেতে দিন!' ছোট ছোট শ্বাস নিচ্ছে কিশোর। 'আমাদের কিছু একটা করতে হবে। আমাকে এখান থেকে বের করার জন্য মাথা খাটাতে হবে। পালানো ছাড়া আর কিছু নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ নেই। আমাকে পালাতেই হবে।'

জোসিয়া কিশোরের উদ্দেশে মাথা কাত করল। কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে, কিশোরের বাহু আর পায়ের স্ট্র্যাপ খুলে দিল। উঠে বসল কিশোর। চামড়ায় চেপে বসেছে স্ট্র্যাপের দাগ, সেখানে হাত বুলোল। এবার জোসিয়ার দিকে ঘুরে চাইল। এই ভিনগ্রহবাসীর সঙ্গে কোনভাবে বন্ধুত্ব করতে হবে ওকে। জোসিয়ার ক্ষমতা আছে সেটা ওকে দেখাতে হবে–এবং সে ক্ষমতা ব্যবহার করে কিশোরকে পালাতে সাহায্য করতে হবে।

'আমাদেরকে একই চিন্তা শেয়ার করতে হবে। আমাদের প্রতি আউন্স ব্রেইন এনার্জি ঢেলে দিতে হবে সেই চিন্তার মধ্যে। এনার্জি ওটাকে সত্য করে তুলবে, জীবন্ত করে তুলবে।' নিজের অবশিষ্ট শক্তি কথাগুলোর মধ্যে ভরে দিল কিশোর।

'মনোযোগী হও।' কিশোর তিন পর্যন্ত গুণে গভীর শ্বাস নিল, চিন্তা যাতে স্বচ্ছ হয়। আশা করছে জোসিয়া ওর কথা বুঝতে পেরেছে, কোন কিছু নিয়ে একাগ্র হওয়ার অর্থ জেনেছে। জোসিয়াকে বুঝতে হবে। বুঝতেই হবে। কিশোরের এখান থেকে বেরনোর এটাই একমাত্র পথ।

'আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে কনসেনট্রেট করুন, ক্যাব্রিয়ায় যাওয়ার আগে আমাকে রেখে যাওয়ার ব্যাপারে মনোনিবেশ করুন। আমাকে মাটিতে কল্পনা করুন। আমাকে সুখী দেখুন, পৃথিবীটার বুকে, আমার বাসায়! আপনি কি কাজটা পারেন না?' মিনতি ঝরল কিশোরের কণ্ঠে।

জোসিয়া একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওর দিকে। বুঝতে পারছে না। কিশোর যেন কোন নিরেট দেয়ালের সঙ্গে কথা বলছে।

'প্লিজ, জোসিয়া। আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করুন।' প্রাণীটার চোখের গভীরে চেয়ে থেকে ওর মনের উপর প্রভাব খাটাতে চাইল। *আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন!*

এবার অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো ওর। জোসিয়ার মন যেন যোগ

দিয়েছে ওর সঙ্গে। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে মনের জোর।

মহাকাশযানটা মৃদু-মৃদু দুলছে। কিশোর অনুভব করল পা-গুলো গুটিয়ে যাচ্ছে তলা থেকে, ঠিক যেভাবে বিমান ল্যান্ডিং গিয়ার ভিতরে টেনে নেয়। মৃদু এক গরগর শব্দ, এবার টিক করে ধাতব আওয়াজ, এবং মনে হলো মহাকাশযানটা বাতাসে ভেসে উঠেছে। আমরা উড়ে যাচ্ছি, ভাবল কিশোর।

স্পেস ক্রেটিনসের সেরা খেলাটার কথা মনে পড়ল ওর, উল্কারাজি যেখানে শত্রুদের মহাকাশযানগুলোকে একের পর এক বোমা মেরে ধ্বংস করে পৃথিবীতে ক্র্যাশ করতে বাধ্য করে। মগজের মধ্যে একটা শক্তিকে কল্পনা করল কিশোর, ওকে যেটা পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বিশাল দুটো হাত চেপে ধরেছে মহাকাশযানটাকে, মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলল ও। দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে মহাকাশযানটার শক্তি হারানোর জন্য অপেক্ষা করছে কিশোর।

এতে কাজ হতে হবে। হতেই হবে।

কোন কিছুই ঘটল না। বরং মহাকাশযানটার গতি আরও বেড়ে গেল। অনেকখানি শূন্যে ভেসে উঠেছে। ছোট, গোল জানালাটার কাছে দৌড়ে গেল কিশোর। নীচে শহরটা দেখতে পেল। আলোর খুদে খুদে বিন্দু দিয়ে যেন নেকলেসের সাজে সেজেছে।

দেয়ালের কাছে ছুটে গিয়ে নব আর বিল্ট-ইন যন্ত্রপাতির লিভারে দুমাদুম কিল বসাল ও। বোতাম টিপছে, সব ধরনের জিনিস চালু হয়ে গেল। একজোড়া রোবট-হাত এক ক্যাবিনেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে বাতাসে খামচি মারল। হিস-হিস শব্দে কামরায় স্প্রে হতে লাগল কেমিকেল।

জোসিয়া তীক্ষ্ণ, ভুতুড়ে চিৎকার ছাড়ল।

'মরলে মরব কিছু যায় আসে না,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কাশছে। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। 'বাড়ি যেতে না পারলে কোথাও যাব না!'

জোসিয়া আবারও চিৎকার ছেড়ে দু'হাতে চোখ ঢাকল।

'তুমি কী করছ নিজেও জানো না। তোমার জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর! এখুনি ঘরটা সিল করে দিতে হবে!'

সাত

চোখ মেলতেই জোসিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হলো কিশোরের। ওর বুকের উপর জোসিয়ার হাতজোড়া চাপ দিচ্ছে। উষ্ণতা আর শক্তির স্রোত বয়ে গেল কিশোরের সারা দেহে।

উঠে দাঁড়িয়ে ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে দরজাটা খুঁজল ও। দৌড়ে বেরিয়ে যেত, কিন্তু জোসিয়া ভেসে যেতে সাহায্য করল। একসঙ্গে ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। কামরাটা পিছনে বন্ধ করে দিল জোসিয়া।

বাইরে বেরুনোর পরও মাথা ঝিমঝিম করছে কিশোরের, গা গুলোচ্ছে।

'অসুস্থ হয়ে পড়ব,' গুঙিয়ে উঠল ও।

কিশোরের বুকের উপর দিয়ে হাত বুলাল জোসিয়া। বমি-বমি ভাবটা কেটে গেল।

'ধন্যবাদ। আপনার ক্ষমতা নেই বলবেন না। আমাদের দু'জনের জন্যে যথেষ্ট আছে।' নতুন বন্ধুর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল কিশোর।

জোসিয়া কিশোরের বুকের দিকে তর্জনী তাক করল।

'আমি কি এখনও ওখানে আছি?'

কিশোর হেসে উঠে হৃৎপিণ্ডের উপরে একটা হাত রাখল।

'হ্যাঁ, আছেন।'

গোলাকার করিডরে এক পোর্টহোল আকৃতির জানালার কাছে ওকে নিয়ে এল জোসিয়া। একসঙ্গে লক্ষ করল ওরা, নীচে পৃথিবীটা প্রকাণ্ড, গোল এক পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। জানালার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তারাদের ঝিকমিক করে জ্বলতে দেখল।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে।' গলায় একটা দলা অনুভব করল কিশোর। 'আমি বন্দি। আর কখনও বাড়ি ফিরতে পারব না।'

না। ও এসব কী ভাবছে? কখনওই, কোনভাবেই এদের কাছে

আত্মসমর্পণ করবে না! শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে। প্রয়োজনে লড়ে মরবে।

'একাগ্রতা আনুন, জোসিয়া,' বলল কিশোর। কণ্ঠ থেকে আতঙ্ক দূর করার চেষ্টা করল। 'এখুনি আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়ার কথা ভাবতে থাকুন। দেখবেন আর কোন সমস্যা নেই।'

জোসিয়া দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

কিশোর এবার অনুভব করল ওর মন জোসিয়ার মনের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। ও কল্পনা করল ওদের দু'জনের মন এমন এক ইস্পাতকঠিন বর্ম তৈরি করেছে, কোন কিছুর পক্ষে যেটা ভেদ করা অসম্ভব।

বিনাবাক্যব্যয়ে, দেয়ালের এক স্লাইডিং প্যানেলের কাছে সরে গেল জোসিয়া। একটা বোতাম টিপল।

মহাকাশযানের এঞ্জিনের ধাতব গর্জন মুহূর্তে থেমে গেল। বাতাস ভরে উঠল মৃত্যুপুরীর নিথরতায়। এবার আচমকা মহাকাশযানটা কাত হয়ে নীচের দিকে পড়ে যেতে শুরু করল।

আরেকটু হলেই ছাদে ঠুকে যেত কিশোরের মাথা। হঠাৎ পতনের ফলে মেঝেতে পিংপং বলের মতন লাফাতে লাগল ও।

জোসিয়া জানালার কাছের এক হাতল চেপে ধরল। কিশোরের দিকে হাত বাড়িয়ে ওর বাহু চেপে ধরল। এক টানে পার্শ্ব দেয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল।

কিশোর জড়িয়ে ধরল জোসিয়াকে।

'কী হচ্ছে এসব?' প্রশ্ন করল। ওর কথার জবাব দিতেই যেন গোটা জাহাজে তীক্ষ্ণ এক অ্যালার্ম বেজে উঠল।

করিডরে একটা ফট-ফট শব্দ হতে শুনল কিশোর। এক কোনা থেকে পাকিয়ে উঠল নীল-কালো ধোঁয়া।

ধাতবের সঙ্গে ধাতবের ঘষা খাওয়ার ভীতিকর শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারদিকে। মহাকাশযানটা ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল। পতন অব্যাহত রইল ওটার।

জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিতে পারল কিশোর, দেখতে পেল পৃথিবীটা ওদের দিকে ধেয়ে আসছে।

'আমরা ক্র্যাশ করব!' আর্তনাদ ছাড়ল ও।

জোসিয়া শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরল। প্রাণীটাকে নরম আটার তালের মত লাগল। বড় বড় চোখজোড়া বন্ধ, মুখের চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই।

কিশোর আচমকা নিরাপদ বোধ করল। জোসিয়া ওর দিকে লক্ষ রাখবে, মন বলছে। কোনভাবে ক্র্যাশ ল্যান্ডিংটা মোকাবেলা করতে পারলে একটা সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে...

'আপনার শক্তি আছে,' জোসিয়াকে বলল ও। 'আপনি শিপটাকে উল্টো ঘুরিয়ে দিয়েছেন!'

চোখ মেলল জোসিয়া। আবারও জ্বলজ্বল করে উঠল ও দুটো। কাঁপুনি আর দুলুনির মাঝে কিশোর অনুভব করল জোসিয়া ওর পাশে রয়েছে।

কিন্তু মাটিতে ধাতবের আছড়ে পড়ার ভয়ঙ্কর শব্দটার জন্য তৈরি ছিল না কিশোর।

মাথার উপর দিয়ে মিসাইলের মত উড়ে যাচ্ছে ইস্পাতের টুকরো, ছিটকে পড়ছে পেটে বাড়ি খেয়ে। দু'ভাঁজ হয়ে গেল কিশোর। শ্বাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে।

তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ আর দুলুনির পর জাহাজটা স্থির হলো। গুঞ্জনের শব্দ করছে। গোল করিডরের ছাদে সাপের মত এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে নীল ধোঁয়ার মেঘ।

কিশোর বসে বসে হাঁফাচ্ছে। জোসিয়ার দিকে চাইল। অবাক বিস্ময়ে দেখল, খুদে ক্যাব্রিয়ানটা দেয়াল থেকে খসে পড়া এক প্যানেলের নীচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে।

'জোসিয়া!' প্রাণীটার বাহু স্পর্শ করল কিশোর। 'জোসিয়া!' কণ্ঠে হিস্টিরিয়া ফুটল ওর।

ওর মনের ভিতরে মৃদু কণ্ঠে কে যেন বলল, 'পালাও!'

কিশোর জোসিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাখল ওর জ্ঞান ফেরে কিনা। দূরের এক কামরায় অন্য ক্যাব্রিয়ান দুটোর কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। ও আশা করল ওরা এখানে দৌড়ে এসে ধোঁয়াটা পরীক্ষা করবে, জোসিয়া সুস্থ আছে কিনা দেখবে। কিন্তু ওরা এল না।

আবারও মৃদু কণ্ঠটা শুনতে পেল ও, 'পালাও!'

পারল না কিশোর।

জোসিয়ার উপর ঝুঁকে পড়ল ও। আলগোছে রুপোলী প্যানেলটা সরিয়ে দিল। ওটার কোন ওজন আছে বলে মনে হলো না।

'লড়ুন, জোসিয়া, আপনার শক্তি জড় করুন,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

জোসিয়ার বুকের উপর একটা হাত রেখে গভীর শ্বাস নিল ও, ভাবছে, আমার শক্তি আপনার ভিতরে ভরে দিচ্ছি। আমার সব শক্তি এখন আপনার।

জোসিয়ার মস্ত চোখজোড়া ছাদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে। কিশোর একটা হাত নাড়ল ওর চোখের উপরে। কোনও স্পন্দন নেই, উজ্জ্বলতা নেই। জোসিয়ার চোখজোড়া কালো, শূন্য জলাধার যেন।

শক্তি। শক্তি। শক্তি।

বৃথা, জোসিয়া নিস্পন্দ শুয়ে। কিশোর একটা আঙুল ঠেকাল ওর বাহুর চামড়ায়, সাড়া পেল না।

'উঠে পড়ুন!' চেঁচাল ও।

এবার নিশ্চয়ই অন্যরা এসে পড়বে, ওকে ধরার জন্য। পরোয়া করে না কিশোর। ওর একটাই চিন্তা—জোসিয়া আহত, ওকে সাহায্য করতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে।

সব দোষ ওর।

গাল বেয়ে পানির ধারা নামল কিশোরের। জোসিয়ার মুখের উপর পড়ল একটা ফোঁটা। তারপর আরেক ফোঁটা এবং আরেকটা। বাচ্চাদের মত কাঁদছ কেন, নিজেকে ধমক দিল কিশোর। কত ভাল হত ডন আর বাঘাকে নিয়ে নিজের ঘরে এখনও ঘুমিয়ে থাকতে পারলে। ভাল হত যদি এসব কিছুই না ঘটত। এই টিনের জঞ্জালটা মাঠের পাশে না নামত, সব কিছু আগের মত থাকত, ব্যাপারটা যদি স্রেফ দুঃস্বপ্ন হত এবং এখন চোখ মেললেই জানা যেত সব মিথ্যে...

ধোঁয়া কেটে যাচ্ছে, কিন্তু শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

এবার জোসিয়ার চোখে আলোর বিন্দু দেখতে পেল কিশোর। ধীরে ধীরে বিন্দুটা বড় হলো। এমুহূর্তে মোমবাতির মত আভা ছড়াচ্ছে।

আবারও কণ্ঠটা চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাও!'

আট

'নিজেকে বাঁচাও,' কিশোরের মাথার ভিতরে বলে উঠল জোসিয়ার কণ্ঠ।

'আপনার কী হবে?' কাতর কণ্ঠে বলল কিশোর।

জোসিয়ার চোখজোড়া একবার পিটপিট করল। কিশোরের বুকের দিকে আঙুল নির্দেশ করল।

'আমি সব সময় ওখানে থাকব।'

'না। আমার সাথে বাসায় চলুন। আমার হিরু চাচা, ডন আর বাঘার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।'

'ডন কে?' প্রশ্ন করল জোসিয়া। ওর শরীর নড়ল না।

মুখ বন্ধ করল কিশোর। আর কথা বাড়াতে চায় না, বিপদ হতে পারে। প্রার্থনা করছে ডন বাড়ি গিয়ে হিরু চাচাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে, যেহেতু পতনের প্রচণ্ড শব্দটা সবাই শুনেছে, পুলিস নিশ্চয়ই রওনা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। গোটা দুনিয়া আমাদের ক্র্যাশ করার শব্দ পেয়েছে, মনে মনে বলল কিশোর।

কান পাতল সাইরেনের আওয়াজ শোনার জন্য, কিন্তু কানে এল শুধু একঘেয়ে ধাতব গুঞ্জন–বাসার ফ্রিজ যেরকম শব্দ করে অনেকটা সেরকম।

জোসিয়া কোনমতে উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে, আড়ষ্টভাবে একটা হাত উঁচু করল। মধ্যমায় কাঁচের স্বচ্ছ এক পাথর নিয়ে চকচকে এক তামার ব্যাণ্ড। জোসিয়া ওটা আঙুল থেকে খুলে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল। কিশোর আংটিটা ওর আঙুলে গলাল। ছোট্ট আংটিটা

আঙুলের গাঁটের একটু উপরে এঁটে বসল।

'বাসায় ফেরার পর এটা দেখিয়ো,' জোসিয়া বলল। 'কেউ অবিশ্বাস করবে না।'

আংটিটার দিকে চাইল কিশোর, অদ্ভুত এক আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কোন দোকানে এধরনের আংটি দেখেনি ও।

'অন্য ক্যাব্রিয়ানদেরকে এটা দেখিয়ো না,' বলল জোসিয়া। 'ওরা চাইবে যা যা ঘটেছে তুমি সব ভুলে যাও।'

'আমি ভুলব না। কখনওই না।'

বিষণ্ণ কণ্ঠে জোসিয়া বলল, 'ভুলে গেলেই তোমার জন্যে ভাল হত।'

কিশোর আংটিটা বুকে চেপে ধরল।

'এটা আমি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সারা জীবন রেখে দেব।'

সহসা জোসিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্য-ক্য করে উঠল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য দুই ক্যাব্রিয়ান। কিশোর অনুভব করল ওদের ক্রোধ বয়ে গেল ওর দেহের ভিতর দিয়ে। জমে গেল ও।

জোসিয়া পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ।

কিশোরের উদ্দেশে ধেয়ে এসে, প্রাণী দুটো ওকে আংশিক বিধ্বস্ত অপারেটিং রূমে ঠেলে নিয়ে গেল। এক টেবিলে শুইয়ে দিল চিত করে। একজন জোসিয়াকে ধাক্কা দিয়ে করিডরে নিয়ে গেল। অপরজন কিশোরের হাত-পা বেঁধে দিল।

কিশোর চেঁচাল, 'আমাকে ছেড়ে যাবেন না, জোসিয়া! প্লিজ!'

দরজার ওপাশে, দৃষ্টিসীমার আড়াল থেকে জোসিয়ার অস্পষ্ট জবাব কানে এল।

বড় প্রাণীটা কিশোরের আঙুলে, জোসিয়ার আংটিটা লক্ষ করল। কান ফাটানো চিৎকার ছেড়ে, কিশোরের আঙুল চেপে ধরে টানতে লাগল।

কিশোর চামড়ার স্ট্র্যাপগুলোর বিপরীতে লাথি মারল, ঝটকা দিল, টানাটানি করল, ঘুষি মারল, চেঁচাল, শরীর মুচড়াল। শরীর নিয়ন্ত্রণহীন, একটা শক্তির প্রবাহ অনুভব করল ও। কিশোর নিশ্চিত ওটা আংটিটা

থেকে এসেছে। ও জানে এখান থেকে বেরোতে যা যা সাহায্য প্রয়োজন সবই করবে এই আংটিটা।

বাহু বেঁধে রাখা স্ট্র্যাপটা প্রথমে ছিঁড়ল। ডান হাত মুক্ত হতেই বাঁ হাত খুলে ফেলল ও, ঘুষি ছুঁড়ে আর শরীর মুচড়ে ঠেকিয়ে রাখল ক্যাব্রিয়ানদের। দু'হাত খোলার পর, পা জোড়া মুক্ত করার চেষ্টা করল ও-কাজটা সহজ হলো না। গোড়ালিতে এঁটে রয়েছে স্ট্র্যাপগুলো, ছেঁড়ার চেষ্টা করতেই গিঁট পাকিয়ে যাচ্ছে।

চোখের কোণে দেখল জোসিয়া কামরায় উঁকি দিচ্ছে। অনুভব করল, জোসিয়া কোনভাবে সাহায্য করছে ওকে, লড়ার জন্য বাড়তি শক্তি জোগাচ্ছে। পায়ের স্ট্র্যাপগুলো ফট করে ছিঁড়ে যেতেই টেবিল থেকে লাফিয়ে নামল কিশোর। এক পাশে কাত করে দিল টেবিলটাকে। বাধা হিসেবে দাঁড় করাল ওর আর বিভ্রান্ত ক্যাব্রিয়ান দুটোর মাঝখানে। এমুহূর্তে, দেয়াল লাগোয়া ভাঙা এক যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত তারা।

এসময় জোরাল বীপের শব্দ বেজে উঠল গোটা মহাকাশযান জুড়ে, কিশোরকে গাড়ির অ্যালার্মের কথা মনে করিয়ে দিল। এই শব্দটাই ওকে অসাড় করে দিয়েছিল এবং এদের হাতে ধরা পড়তে বাধ্য করেছিল। এবার আর থামবে না কিশোর।

জোসিয়ার কথাগুলো বাজতে লাগল ওর মাথার মধ্যে।

'লড়ে যাও। বীপের শব্দ মনে ঢুকতে দিয়ো না। মন বন্ধ করো। ওটার বিরুদ্ধে ভাবো, এগিয়ে যাও।'

কিশোর আংটিটা ঘষল। নিশ্চিত হয়ে নিল ওটা যথাস্থানেই আছে। এবার দু'মুঠোর উপর চোখ রাখল। মুঠো দুটো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, কিল-ঘুষি মেরে কামরা থেকে বেরিয়ে এল করিডরে। পিছনে মারামারি, ধাক্কাধাক্কির শব্দ। গলা ছেড়ে চিৎকার করল কিশোর। দেয়াল থেকে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চলা বীপগুলোকে চাপা দিল ওর কণ্ঠ।

যদি শুধু দরজাটা খুঁজে পেত, যদি মনে করতে পারত কীভাবে এখানে ঢুকেছিল, কিন্তু পারল না। একঘেয়ে বীপের শব্দ সম্মোহিত

করে ফেলেছে ওকে। কিছুই মনে আসছে না। কিন্তু ওকে পালানোর পথ খুঁজে বের করতেই হবে।

ওরা ওকে তাড়া করছে কেন? যেতে দিলে কী হয়? ওরা ওকে পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিল। নিশ্চয়ই আংটিটাই কারণ। ওরা চায়নি ওটা ওর কাছে থাকুক। ওরা চায়নি কিশোর যে ওখানে গিয়েছিল তার কোনও প্রমাণ থেকে যাক।

ও যদি ওদেরকে আংটিটা দিয়ে দেয় তা হলে হয়তো ওরা ওকে যেতে দেবে।

আংটিটা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না কিশোর।

প্রাণী দুটো চকচকে মেঝের উপর দিয়ে ভেসে এল, পরস্পরের সঙ্গে ক্য-ক্য করে কীসব বলাবলি করছে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছে ওকে, ধরার কোন চেষ্টাই করছে না। ওরা জানে পালাবার পথ নেই। কখনওই এখান থেকে বেরোতে পারবে না কিশোর।

এক দেয়ালে হেলান দিয়ে আংটিটার দিকে চাইল ও। এখন আর ওটা ক্রিস্টালের মত স্বচ্ছ নয়, তবে উজ্জ্বল কমলা রং ছড়াচ্ছে। গরম হয়ে উঠেছে, আঙুল পুড়ে যাওয়ার জোগাড়। খুলে ফেলতে হবে।

প্রাণী দুটো প্রায় বিশ ফীট দূরে।

আংটিটা ধরে টানতে লাগল কিশোর। শক্ত হয়ে উঠেছে চোয়াল। তপ্ত পাথরটা ওর আঙুল পুড়িয়ে দিচ্ছে। হঠাৎই একটা হ্যাচ ডোর হড়কে খুলে গেল ওর পাশে। উন্মুক্ত হলো সতেজ, ভেজা-ভেজা পৃথিবীর তারাভরা রাতের আকাশ, ও আর কখনও যা দেখতে পাবে বলে ভাবেনি।

কমলা পাথরটা এখন আর আঙুল পোড়াচ্ছে না। আবার স্বচ্ছ হয়ে গেছে। আংটিটা কি কোন ধরনের দরজা খোলার যন্ত্র? ভাবল ও। হিরু চাচার গ্যারেজ খোলে এক লাল-আলোর সেন্সর দিয়ে।

মহাকাশযান থেকে রাতের অন্ধকার গহ্বরে লাফ দিল কিশোর।

নয়

পতনটা যেন অন্তহীন। মনে হচ্ছে ও বুঝি মাঝ আকাশ থেকে লাফ দিয়েছে। কিশোরের দৃষ্টি খেলে গেল পরিচিত গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় আর ঠিক ওর নীচের এক কম্পমান সাদা-কালো পিণ্ডের উপরে।

এক গুচ্ছ ঝোপের উপর পড়ল ও। তারপরে গড়িয়ে এসে থামল র‍্যাগির নরম, লোমশ পেটের কাছে।

থরথর করে কাঁপছে গরুটা, প্রলম্বিত, জোরাল, অভিযোগপূর্ণ ডাক ছাড়ল।

'ওহ, র‍্যাগি, তুই ছাড়া পেয়েছিস! আমাদের বন্ধু জোসিয়া তোকে ছেড়ে দিয়েছে!'

কিশোর লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে র‍্যাগিকে জড়িয়ে ধরল।

ওদের মাথার উপরে মৃদু মৃদু দুলছে জাহাজটা। ওটার নীলচে-লাল আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎই সাদা আলোর ঝলকে নিভে গেল বাতিগুলো। নাকে এল ধোঁয়ার দুর্গন্ধ।

কিশোর র‍্যাগির কলার চেপে ধরে টানতে লাগল। নড়বে না জানোয়ারটা। পা চারটে দস্তুরমত কাঁপছে। কিশোর জোরে এক চাপড় মারল র‍্যাগির পিছে। এবার দৌড় দিল ওটা। র‍্যাগিকে এত জোরে আগে কখনও ছুটতে দেখেনি ও। ক'সেকেণ্ডের মধ্যেই ট্রেইলে বাঁক ঘুরে মাঠের গেটের কাছে পৌঁছে গেল।

ডিম্বাকৃতি বিধ্বস্ত জাহাজটা কাঁপছে, ফট-ফট শব্দ করছে, এবং পিছনের আস্ত চাঁদের বিপরীতে আভা ছড়াচ্ছে। কিশোর চকিতে ওটার দিকে চাইল। ওর মনে হলো ছোট, গোল কোন এক জানালায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে জোসিয়া। পাগলের মত পাল্টা হাত নাড়ল ও। হাঁ করে চেয়ে রইল অপসৃয়মাণ চাকতিটার দিকে।

জাহাজটার তলা থেকে নীল-সাদা আলো ঝলসাচ্ছে, বিন্দু বিন্দু আলো দিয়ে তৈরি আংটির মত। বিদ্যুৎগতিতে এক পাশে সরে গিয়ে

থেমে গেল ওটা। নীলচে-সাদা আলোটা ওটার পিছনে প্রথমে মিটমিট করে জ্বলল, তারপর তীব্র উজ্জ্বলতা ছড়াল। আবারও গুলির মতন ছিটকে উঠল ওটা, এবং আকাশে বৃত্তাকার আলো তৈরি করে, কোনাকুনি উপরে উঠে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়ির দিকে দৌড়ল কিশোর। অন্তত ওর তাই ধারণা হলো। ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে, পতিত গুঁড়ির উপর দিয়ে লাফিয়ে ও বাড়ির উদ্দেশে ছুটছে নাকি একই জায়গায় গোল হয়ে ঘুরছে বলা শক্ত।

অন্ধকারে অনন্তকাল ছোটার পর ডনের ফ্ল্যাশলাইটটা খুঁজে পেল ও। ডন নিশ্চয়ই বাসায় চলে গেছে। ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালল কিশোর, চারপাশে আলো ফেলতেই পথটা চিনতে পারল। বাড়ি কাছেই, বাড়ি!

আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল। ওর পিছনে, গাছ-পালার মাথা ছাড়িয়ে কয়েকটা জ্বলন্ত লাল আঙুল। চক্রাকারে ঘোরা সার্চলাইটগুলো ফিরে এসেছে। জাহাজটা এমুহূর্তে দৃষ্টিসীমার বাইরে, কিন্তু খুব সম্ভব মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে।

ওটা মনে হয় আর ফিরবে না, যদি পতনের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, কিংবা ক্যাব্রিয়ানরা হয়তো ওঁৎ পেতে থাকবে এবং কিশোর বনভূমি থেকে বেরোলেই পাকড়াও করবে।

যত যা-ই হোক, ও বাড়ি যাবে। এখুনি।

নিঃশব্দে ট্রেইল ধরে পা বাড়াল কিশোর। পথ করে নিচ্ছে চাঁদের আলোয়। হাত তুলে আজব আংটিটার দিকে চাইল ও। জিনিসটা কোত্থেকে এসেছে এবং কেন ওর আঙুলের গাঁটের উপর চেপে বসে আছে মনে করার চেষ্টা করল। ও তো আংটি পরে না।

বাড়ি যখন পৌঁছল ভয়ানক ক্লান্ত ও। পরনের কাপড়-চোপড় ভেজা আর কাদামাখা। ঘড়িতে বাজে রাত ১ টা। মাত্র পনেরো মিনিট আগে কিশোর ডনকে বিছানায় এসে শোয়ার জন্য চেঁচামেচি করছিল। জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল ও, একটা উল্কার পতন দেখছিল...

***

খুনি লাশ

টিপু কিবরিয়া রচিত 'জিন্দালাশ' বইটি
তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর করেছেন শামসুদ্দীন নওয়াব।
প্রথম প্রকাশ: ২০১২

এক

একেবারে বিনা নোটিশে শুরু হয়ে গেল ঝমাঝম বৃষ্টি। আঁধার আরও চেপে এল। কড়-কড়-কড়াৎ! দুনিয়া কাঁপানো বিকট শব্দে বাজ পড়তে চমকে উঠল তিন গোয়েন্দা। পরমুহূর্তে নিভে গেল সমস্ত আলো। একেবারে কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে গেল রকি বিচ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। একবার তেড়েমেরে আওয়াজ তুলল প্রকাণ্ড শক্তিশালী জেনারেটার, তারপর এক সেকেণ্ড পর থেমে গেল। বিকল হয়ে গেছে যন্ত্রটা। আর বিদ্যুৎ এল না।

'খাইছে!' চমকে গিয়ে বলে উঠল মুসা।

ওর কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে কিশোর ও রবিন। রাতকানা মুরগির মত গলা লম্বা করে ওকে দেখবার চেষ্টা করল দু'জন, কিন্তু কাজ হলো না। কিছুই দেখা যায় না।

একটু পর আকাশে ফের চমকে উঠল বিদ্যুৎ। মুহূর্তের জন্য। সেই আলোয় ছোট লাশকাটা ঘরের প্রতিটা ইঞ্চি স্পষ্ট দেখল ওরা। মুসাও দেখল ওদেরকে, দ্রুত পায়ে চলে এল পাশে। বাইরে শোঁ-শোঁ করছে দামাল হাওয়া। বিদ্যুচ্চমকের আলোয় পাম গাছের উন্মত্ত মাথা পাগলের মত ডানা ঝাপটাচ্ছে। যেন তীব্র আপত্তি তুলছে দেবী দুর্গার মত শূন্যে দশ হাত ছুঁড়ে।

হাওয়ার বেগ বাড়ছে।

লালচে হয়ে উঠছে আকাশের রঙ।

ভয়াবহ দুর্যোগের লক্ষণ।

'এবার বোধহয় তোমার জন্যে বিপদেই পড়লাম,' নরম স্বরে বলল

রবিন। 'তখন এত করে বললাম আজ থাক, আবহাওয়ার লক্ষণ ভাল নয়।'

রবিন ও কিশোর আগামীকাল মুসার অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু না, মুসার জেদ—আজ না এলে চলছে না।

'তখন কি জানতাম এই অবস্থা হবে?' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা।

'থাক এ প্রসঙ্গ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এখন মুখ কালো করার সময় না—করলেও কেউ দেখতে পাব না। বাড়ি ফিরব কী করে, সেটা ভাবো।'

কাল শনিবার, স্কুল ছুটি। তাই সন্ধের দিকে হঠাৎ করে মুসা প্রস্তাব দিয়ে বসল, মেডিক্যাল কলেজে ওর ছোট খালাকে দেখতে যাবে। প্রায় এক সপ্তাহ হলো ওখানে আছেন খালা, সবাই দেখে এসেছে। কেবল মুসাই বাকি। নানান কাজে আজ যাই কাল যাই করে যাওয়া হয়নি। আজ হঠাৎ করে 'উঠল বাই কটক যাই' অবস্থা পেয়ে বসল ওকে।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে, সন্ধে হয়ে গেছে, ইত্যাদি বলেও ঠেকানো গেল না ওকে। ওর খালা পেয়িং কেবিনে আছেন, ওখানকার রোগীদের জন্য সাধারণ ভিজিটিং আওয়ার প্রযোজ্য নয়, যখন তখন ভিজিটার যেতে পারে। আর সন্ধে? হয়েছে তো কী! যেতে-আসতে কতক্ষণই বা লাগবে?

ফোক্সওয়াগেন নষ্ট তো কী?

মুসার চাপাচাপিতে আসতে রাজি হয়েছে কিশোর ও রবিন। ওদের নিজেদের তেমন কিছু করার ছিল না। পরীক্ষা শেষ হয়েছে কিছুদিন হলো। স্কুল 'ডাল' চলছে। পড়াশোনার চাপ নেই। অতএব...

তবে ওরা যখন নিজেদের সাইকেলে রওনা হলো, আকাশের অবস্থা বিশেষ সুবিধের ছিল না। এলোমেলো বাতাস একটু একটু বাড়ছে তখন। গাঢ় মেঘ ছিল পুবের আকাশে, তার আড়ালে ঘন ঘন চমকাচ্ছিল বিদ্যুৎ। তেমন গুরুত্ব দেয়নি কেউ, ভেবেছে বাতাসে উড়ে যাবে মেঘ।

কিন্তু হয়েছে উল্টো। বাতাসের সাথে মেঘ বরং আরও ঘন হয়ে জমাট বেঁধেছে। ওরা বুঝতে পারেনি খালার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে।

সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে এসে হঠাৎ কিশোরের খেয়াল হলো এখানকার মর্গের কথা। ওর জানা অপমৃত্যুর শিকার প্রতিটা মৃতদেহ সেখানে কাটাছেঁড়া করা হয়।

বেশ কৌতূহল-জাগানি ব্যাপার।

অভিজ্ঞ ডোম ছুরি দিয়ে মৃতদেহ কাটে, মেডিক্যালের জুনিয়র ছাত্ররা পাশে দাঁড়িয়ে তাই দেখে অ্যানাটমি শেখে, মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করে। কিশোরের মর্গ দেখার প্রস্তাবে আপত্তি তোলেনি রবিন। তবে মুসা তুলেছে । কিন্তু ওর বাধা ধোপে টেকেনি। কিশোরের কথা: মর্গ-ঘর দেখলে বহু কিছু জানা যেতে পারে। তা ছাড়া, ওই ঘরের সঙ্গে রয়েছে রহস্যের একটা গন্ধ।

ওরা ভেবেছিল মর্গে দেখবার মত তেমন কিছু থাকবে না। মূল হাসপাতাল থেকে আলাদা এখানকার মর্গ। নিচু ছাদের একটা মাঝারি আকারের কামরা। ওপাশে আরও একটা ঘর, সেটায় কাঁচের শেলফে সাজানো নানা কেমিক্যাল, গজ-ব্যাণ্ডেজ, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি।

প্রথম ঘরের নোংরা, জং ধরা লোহার অপারেটিং টেবিলে একটা লাশ—সাদা চাদরে ঢাকা। ছোপ ছোপ রক্ত লেগে আছে চাদরে। কাটাছেঁড়া হওয়ার অপেক্ষায় রাখা আছে দেহটা।

এরপর আর ওখানে থাকতে চায়নি মুসা। কিন্তু কিশোর ও রবিন লাশটাকে আমল দেয়নি। একটা মৃতদেহই তো, অত আর কী? কিন্তু এখন, এই অন্ধকার মর্গে দাঁড়িয়ে গা ছমছম করছে তিন গোয়েন্দার। একই ঘরে ঘন অন্ধকারে তিনজন জীবিতের সঙ্গে একটা মৃতদেহ, তাও অজানা-অচেনা—ভাবতে কেমন লাগে না?

বিদ্যুৎ চমকের নীলচে আলোর ছটায় ওটাকে দেখছে কিশোর-রবিন-মুসা। বাতাসে একটু একটু নড়ছে চাদর। মানুষটা বেশ লম্বা-চওড়া। হলদেটে পা বেরিয়ে আছে চাদরের তলা দিয়ে। গোড়ালির নীচের অংশ টেবিলের কিনারা পেরিয়ে ঝুলছে।

এখন অবস্থা সুবিধের লাগছে না কিশোরের, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য সম্ভব হচ্ছে না। এত চেপে বৃষ্টি পড়ছে যে বেরুলেই ভিজে চুপচুপে হতে হবে। মূল ভবনে পৌঁছতে

পৌঁছতে স্রেফ গোসল হয়ে যাবে প্রত্যেকে।

'বাসায় ফিরলে কপালে আজ নির্ঘাত বকা আছে,' আপন মনে বলল রবিন। 'কেন যে এলাম! এতক্ষণ...' বাজ পড়ার ভয়াবহ নিনাদে আঁতকে উঠে থেমে গেল।

কিশোর-মুসাও কেঁপে উঠল।

'বাপরে বাপ!' আওয়াজ কমে আসতে বলল মুসা। 'কী আওয়াজ! বুক এখনও কাঁপছে আমার!'

'শুধু শব্দ শুনে এই অবস্থা!' আনমনে বলল কিশোর। 'আর ওই লাশ উঠে বসলে?'

'খাইছে! হার্টফেল করে মরব,' খোলাখুলি বলল মুসা।

বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতে হাত তুলে মৃতদেহটা দেখাল রবিন। বুক কাঁপছে ওর। 'বাতাসে সরছে চাদর! মনে হয় নড়ছে লাশটা!'

'যেরকম বাতাস!' বলল কিশোর। অজান্তে কেঁপে গেল গলা। 'লাশ আবার জেগে ওঠে নাকি?'

'ওঠে,' মাথা দোলাল মুসা। 'জিন্দালাশের কাহিনি শোনোনি? ওগুলো খুনিও হয়!'

এবার মনে হলো সত্যি ভয় পেল রবিন। 'যাও তো! যতসব অলক্ষুণে কথা!' কিশোরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠল মর্গের। হলদেটে আলো। কোনও দুর্বল জেনারেটার চালু করা হয়েছে। দূর থেকে আসছে আওয়াজ।

আলো সয়ে আসতে ভুরু কুঁচকে চাইল ওরা। একটু দূরের মূল হাসপাতাল ভবনেও আলো জ্বলছে, তবে আগের মত সবখানে নয়। একই রকম হলদেটে, ম্লান আলো।

'ইমার্জেন্সি অকযিলারি জেনারেটর চালু করা হয়েছে,' কিশোর বলল।

'তাও ভাল,' বলল রবিন। 'কিন্তু এখন বাসায় ফিরব কী করে? সাড়ে দশটা বেজে গেছে। এই বৃষ্টিতে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'না পেলে আর কী!' কিশোর বলল। 'সাইকেল চালিয়ে ফিরব।'

'আর বৃষ্টিতে ভিজলে ঠিক জ্বরে পড়ব,' বলল রবিন।

'চিন্তা কোরো না,' কিশোর বলল। 'আর কিছুক্ষণ দেখি বৃষ্টি থামে কি না।'

'যদি না থামে?' বলল রবিন।

'সে তখন দেখব। এখন এসো...' মৃদু গোঙানির আওয়াজ কানে আসতে থেমে গেল কিশোর। ভুরু কুঁচকে এদিক-ওদিক চাইল। রবিন আর মুসার কানেও গেছে শব্দ। আড়মোড়া ভাঙার সময় মানুষের মুখ দিয়ে অজান্তে যেমন বেরয়, অনেকটা তেমনি। 'কীসের শব্দ?'

'জানি না,' রবিন বলল। সে-ও এদিক-ওদিক চাইছে। 'তুমি আওয়াজ করেছ?' মুসাকে প্রশ্ন করল।

বিস্ফারিত চোখে মৃতদেহটার দিকে চেয়ে আছে মুসা। চেহারা একদম ফ্যাকাসে, কপালে জমছে ঘামের কণা। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। কথা বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

রবিনের মধ্যে সংক্রামিত হলো ওর ভয়। ঘুরে চাইল দেহটার দিকে, বেড়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। 'ভয় পেয়ো না, মুসা,' ফিসফিস করে বলল বটে, কিন্তু নিজেই ভয় পেয়েছে।

মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল কিশোর। নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল, 'আমার মনে হয় ওই লোকটা জেগে উঠছে!'

আবার শোনা গেল আওয়াজটা। মৃতদেহের দিক থেকেই। চট করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ওরা।

কিশোরের আস্তিন খামচে ধরল মুসা। আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'ঠিক, কিশোর! ওটা... ওটা... নড়ছে! জেগে উঠছে!'

'তা হয় কী করে...' কথা শেষ করল না কিশোর, মৃতের বেরিয়ে থাকা পায়ের আঙুল নড়তে দেখে থমকে গেল। সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের খাটো চুলগুলো।

তিন গোয়েন্দার বিস্ফারিত চোখের সামনে মৃতের মুখের উপর থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল চাদর। একজোড়া হলদেটে চোখ বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইল ওদের দিকে।

মুখ নড়ছে নিঃশব্দে। কিছু বলতে চাইছে ওটা। কিন্তু শব্দ বেরুচ্ছে না গলা দিয়ে। মুখটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর-রবিন-মুসা। লম্বাটে, শুকনো চেহারার এক যুবক। গালে ক'দিনের খোঁচা দাড়ি। মুখের দুই কষায় গ্যাঁজলা।

পিটপিট করে উঠল লাশের চোখ, যেন বুঝে নিল কোথায় আছে। তারপর গায়ের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিল ধস্তাধস্তি করে। গড়গড় আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে।

দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে। আতঙ্কে জড়সড় ওদেরকে দেখল কয়েক মুহূর্ত।

তারপর উঠে বসল। তীব্র আতঙ্কে বিরাট একটা হাঁ করল মুসা। কোটরের ভিতর দুই চোখ হয়ে উঠেছে রসগোল্লা।

দুই

ধপ করে বসে পড়ল মুসা। ওর দিকে চাইবার সময় নেই কিশোর ও রবিনের। ঘাড়ের উপর জ্যান্ত বিভীষিকা।

চাদর ফেলে দিয়েছে জিন্দালাশ, তার ডান কাঁধের অনেকখানি জায়গায় জমাট বাঁধা রক্ত। সশব্দে আঁতকে উঠল মুসা। 'খাইছে—খাইছে! সর্বনাশ!' ফিসফিস করে বলল, 'কীসের মুখে পড়লাম!'

'তোমরা শান্ত থাকো,' জীবন্ত আতঙ্কের উপর চোখ রেখেছে কিশোর, ঠোঁট না নেড়ে বলল, 'আমাদের পালাতে হবে!'

ভুরু কুঁচকে রবিনকে দেখল মুসা। বিড়বিড় করে বলল, 'একটু আগে ভাল ছিলাম, আর এখন ভূত এসে ঘাড়...' তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওদিকে জিন্দালাশের উপর চোখ রেখেছে কিশোর।

টেবিল থেকে নেমে পড়েছে লাশ। এক হাতে কপাল চেপে ধরেছে, অন্য হাতে টেবিলের কোনা আঁকড়ে ধরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে নিল। একটু একটু কাঁপছে।

দুর্বল।
রক্তশূন্য।
চাউনি ঘোলাটে।
যুবকের পরনে লিভাইস জিন্স। গায়ে খয়েরি রঙের টি-শার্ট। নোংরা হয়ে আছে, ধুলোমাটিতে গড়াগড়ি খেলে যেমন হয়। টি-শার্টে ছোপ ছোপ রক্ত। ডান কাঁধের কাছটা পুরোপুরি রক্তাক্ত। শুকিয়ে খড়খড় করছে।
ওখানে ছোট একটা ফুটো দেখছে কিশোর। সুতো বেরিয়ে আছে। ব্যাণ্ডেজের সুতো। কীসের ফুটো ওটা, কিশোর ভাবল। গুলির? নাকি...
লোকটাকে সরাসরি ওর দিকে চাইতে দেখে আঁতকে উঠল মুসা।
কপাল থেকে হাত নামিয়ে রক্তচক্ষু মেলে তিনজনকে দেখছে সে পালা করে। পাশ থেকে কিশোরের পিঠে খোঁচা মারল মুসা।
'কিশোর!' ফিসফিস করে বলল। 'চেনা চেনা লাগছে... কোথাও দেখেছি।'
ঠিকই বলেছে মুসা, আরেকবার ভাল করে দেখে নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছল কিশোর। সত্যি পরিচিত লাগছে। কিন্তু, কে সে?
'কে আপনি?' প্রায় স্বাভাবিক স্বরে প্রশ্ন করল কিশোর। 'আপনি... আপনি তা হলে মারা যাননি! কী করে...'
বাহুতে টান খেয়ে থেমে গেল। মুসা ওর হাত ধরে টানছে পাশ থেকে।
'ওটা একটা লাশ!' চাপা গলায় বলল মুসা। 'মরা মানুষ!'
'থামো!' মৃদু ধমক দিল কিশোর। 'লাশ কখনও উঠে দাঁড়ায়? বেঁচে আছে।'
'পাঁচ মিনিট আগেও টেবিলে কাঠ হয়ে পড়ে ছিল,' বেসুরো স্বরে বলল মুসা। 'তা ছাড়া, না মরলে হাসপাতালের মর্গে কেন? ভূত, না হলে...'
কিশোরের ভয় হলো আবার সাহস হারাবে মুসা, তাই তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল, 'দূর! কীসের ভূত? এসো আমরা বেরিয়ে যাই।'
বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন, নিঃশব্দে।

এখন আর বাজ পড়ছে না। শুধুই আলো ঝলসে উঠছে। বৃষ্টির তোড় আর বাতাসের বেগ যেন আরও বেড়েছে।
'ত-তাই করি চলো, চলে যাই আমরা,' বলল রবিন।
দরজার দিকে পা বাড়াল ওরা, কিন্তু বাজখাঁই গলার এক ধমক খেয়ে জায়গায় জমে যেতে হলো।
'দাঁড়াও!' গর্জে উঠল জিন্দালাশ। 'কেউ কোথাও যাচ্ছ না তোমরা। নড়বে না জায়গা থেকে।'
হাঁ করে লোকটার দিকে চাইল মুসা ও রবিন। এই প্রথম বুঝল ওদের তুলনায় যথেষ্ট লম্বা লোকটা— প্রায় ছয় ফুট হবে। তেমনি পেশিবহুল। শরীরে ভালই শক্তি রাখে। এর সঙ্গে পারবে না ওরা। মর্গে ঢোকার দরজার দিকে চাইল কিশোর। বেরুতে হলে লোকটার পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যদি বাধা দেয়?
'পিছিয়ে যাও!' কড়া গলায় বলল সে।
'আপনাকে আমরা ভয় পাই না,' সাহস করে বলল কিশোর।
রবিন বলল, 'আপনি তো মরা মানুষ। তা ছাড়া, কোনও শক্তি নেই আপনার।'
'মরামানুষ!' হতভম্ব দেখাল তাকে। 'আমি মৃত! মানে মরে গেছি?' চোখ নামিয়ে নিজেকে দেখল সে। দু'হাত উল্টে-পাল্টে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। 'মরা!'
'অবশ্যই মরা!' ঢোক গিলে বলল মুসা। 'না মরলে হাসপাতালের মর্গে কী করে এলেন আপনি?'
'মর্গ! এটা মর্গ?'
'হ্যাঁ। রকি বিচ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গ।'
এদিক-ওদিক চাইতে লাগল লোকটা। চেহারা দেখে মনে হলো যেন ভীষণ ধাঁধায় পড়েছে।
নড়াচড়া করতে গিয়ে ডান কাঁধে ব্যথা লাগতে চেহারা বিকৃত করল। বাঁ হাতে জায়গাটা চেপে ধরতে গিয়ে একটু যেন চমকে উঠল, তারপর নজর নামিয়ে জায়গাটা দেখল সে।
'ঠিক বুঝছি না,' প্রায় বিড়বিড় করে বলল। 'সকাল বেলা, ঘুম

থেকে উঠে...' হঠাৎ থেমে গেল সে। চোখ-মুখ কুঁচকে কী যেন ভাবতে শুরু করেছে।

'তারপর... তারপর হঠাৎ গুলি...'

'গুলি!' চমকে উঠে বিড়বিড় করে বলল মুসা, 'এ তো জিলাপির মত প্যাঁচালো! সকালে ঘুম থেকে উঠে মানুষ নাস্তা খায়, আর এ খেয়েছে গুলি? মরা ছিনতাইকারী...'

ওদিকে বিড়বিড় করতে শুনে চোখ গরম করে চাইল লোকটা। 'অ্যাই!' ধমকে উঠল। 'কী বলছ তুমি?'

'না, মানে...'

'আমি ছিনতাইকারী নই, বুঝতে পেরেছ?'

'তা হলে গুলি খেয়েছেন কেন?' এবারও বিড়বিড় করে বলল মুসা।

'কথা কেউ আস্তে বলবে না!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। ধমক এত কড়া যে সবাই চমকে গেল। ওদের ভীত চেহারা দেখে সন্তুষ্টি ফুটল লোকটার মুখে।

জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর-রবিন-মুসা। আয়নায় দেখলে বুঝতে পারত, ওদের চেহারা কী পরিমাণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। নজর ঘুরিয়ে নিজের চারদিকে চাইল লোকটা। কান পেতে ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ শুনল কিছুক্ষণ।

'এটা কোন্ জায়গা বললে?'

'মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল,' কিশোর বলল। 'আপনার নাম কি জানতে পারি?'

মুসা বলল, 'আপনাকে কিন্তু চেনা চেনা লাগছে।'

'তাই নাকি?'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল। 'আগে কোথাও দেখেছি আপনাকে।'

'হতে পারে,' বলেই ভুরু কোঁচকাল লোকটা। 'আজ কী বার? কত তারিখ?'

'শুক্রবার। এগারোই জুন,' কিশোর বলল।

তারিখ শুনে বড় ধরনের ঝাঁকি খেল লোকটা। উত্তেজনায় ঘন ঘন নাকের ফুটো স্ফীত হতে লাগল। 'কত সাল?'

'সাল মানে সন?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কত সাল?'

'দুই হাজার বারো।'

এবার যেন একটু স্বস্তি ফুটল তার চেহারায়। 'ওহ! আমি ভেবেছিলাম...' থেমে মাথা চুলকাল। 'চার মাস! চার মাস জেলে কেটেছে আমার!'

'জেলে!' কিশোর বলল।

'কোর্টে এসেছিলাম আজ সকালে,' ওর প্রশ্ন কানে না তুলে আপনমনে বলে চলল লোকটা। 'জামিন পেয়ে বাসায় ফিরলাম। কিন্তু... হ্যাঁ, এইবার! এইবার ওদের সবাইকে দেখে নেব আমি!'

'কীসের কথা বলছেন?' প্রশ্ন করল কিশোর। লোকটার ভাব দেখে অস্বস্তি বোধ করছে ও। ভাবতে শুরু করেছে বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছে কি না।

'আপনি জেলে... মানে আপনাকে জেলে দেয়া হয়েছিল কী অপরাধে?' মুসা জানতে চাইল।

'আমি কোনও অপরাধ করিনি,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল সে।

'তা হলে?' কিশোর বলল। 'শুধু শুধু কেন জেলে দেয়া হবে?'

কঠোর হাসি ফুটল যুবকের ঠোঁটে। 'অপরাধ একটা অবশ্য রয়েছে, তবে সেজন্যে আমি দায়ী নই।'

ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি শুরু করল সে। উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা। চোখে গভীর চিন্তার ছাপ। আপনমনে কী সব বলছে বিড়বিড় করে। মৃতদেহ কাটাছেঁড়ার যে টেবিলে এতক্ষণ শুয়ে ছিল, সেটার মাথার কাছে ছোট একটা দেয়াল-আলমারি। কিছু কাঁচের বোতল রাখা ওটাতে।

বেখেয়ালে সেটার সাথে ধাক্কা খেল যুবক। কাঁচ ঝনঝন করে উঠতে চিন্তার খেই হারিয়ে রেগে উঠল। ঝুঁকে ধুম করে ঘুসি মেরে বসল ওটার ওপর। চুরমার হলো আলমারির পাল্লা। ভেঙে খান খান

হয়ে গেল পাল্লার কাঁচ, ভেতরের বোতল।

পাল্লার ভাঙা এক টুকরো কাঁচ তার হাতের উল্টোদিকে গেঁথে গেছে, তাই দেখে কিশোরের বাহুতে মৃদু খোঁচা লাগাল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'ওর হাত দেখো! কাটা জায়গা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে না!'

সত্যি তাই। অবাক বিস্ময়ে দেখছে কিশোর। এক ফোঁটা রক্ত দেখা যাচ্ছে না ওই ক্ষতে। তাকে দেখে মনেই হচ্ছে না হাতে কাঁচ ঢুকেছে।

'এইবার প্রতিশোধ নেব আমি,' বলল যুবক। 'ওদের সবাইকে খুন করব এক এক করে।'

'কী বললেন?' সাহস সঞ্চয় করতে চাইল কিশোর। 'খুন!'

'হ্যাঁ। খুন! ওদের সবক'টাকে খুন করব আমি।'

'কার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছেন আপনি?'

'ওদের সবার ওপর!' একঘেয়ে সুরে বলে চলেছে যুবক। ঘৃণায় কুঁচকে আছে চেহারা। এমনভাবে তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন সামনে শত্রু দেখতে পাচ্ছে। 'কেউ রেহাই পাবে না আমার হাত থেকে। ওরা সবাই আমার জানের শত্রু।'

মুসা ও রবিনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো কিশোরের। 'কেন?' প্রশ্ন করল ও। 'কী করেছে "ওরা"?'

'কী করেছে?' চোখ গরম করে ওর দিকে ফিরল সে। 'ম্যাজিস্ট্রেট রব, ওই হারামজাদা বিনা দোষে চার মাস জেল খাটিয়েছে আমাকে। অন্য এক ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে গতকাল বেরুলাম, আজ ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই গুণ্ডা কাসলার গুলি করল আমাকে। সময়মত পালিয়ে না গেলে শয়তানটা আমাকে জানেই মেরে ফেলত...'

প্রথম নামটা শুনে শক্ত হয়ে গিয়েছিল কিশোর। দ্রুত বাধা দিয়ে বলল, 'কোন রব? ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট গোলান রবের কথা বলছেন আপনি?'

'কোন ক্লাস জানি না!' ঝাঁঝিয়ে উঠল লোকটা। 'তবে নাম ঠিকই

আছে।' থেমে ভুরু কোঁচকাল। 'তুমি কী করে জানলে তার কথা?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর, 'উনিই তো? কিলনার বিচে থাকেন?'

এবার বিস্ময় লোকটার চোখে। 'তুমি চেনো লোকটাকে?'

'মনে হয়,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল কিশোর। আসলে মনে হয় না, ম্যাজিস্ট্রেট গোলান রবকে খুব ভাল করে চেনে ও। কারণ উনি শ্যারনের বড় চাচা। সৎ অফিসার বলে যথেষ্ট সুনাম আছে তাঁর।

অন্যদিকে কাসলার হচ্ছে গোল্ডেন বিচ এলাকার ত্রাস। হেরোইন কাসলার বলে ডাকে লোকে। এক সময় ট্রাকের হেলপার ছিল, কেউ কেউ হেলপার কেসলার বলেও ডাকে। পরে লোকটা হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর এক সন্ত্রাসী।

লস অ্যাঞ্জেলেসের বেশ কিছু এলাকায় সে হেরোইন, এলএসডি ও ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবসা করে। কয়েক বছরের মধ্যে কোটিপতি বনে গেছে। এখন বলতে গেলে গডফাদার সে গোল্ডেন বিচ এলাকার।

কিশোর যতদূর জানে কিছুদিন আগে আরেক সন্ত্রাসী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার এলাকায়। হেক্টর জন্সটন তার নাম। একসময় নাকি গোল্ডেন বিচের বাজারে মুরগি জবাই ও চামড়া খসানোর কাজ করত হেক্টর। সেখান থেকে তার উত্থান। লোকে তাই মুরগি-ছিলা হেক্টর বলে ডাকে।

ওদের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, কিশোরের বিশ্বাস এ সেই মুরগি-ছিলা হেক্টর। কয়েক মাস আগে হেরোইন কাসলারের সঙ্গে দু'নম্বরী ব্যবসার বখরা নিয়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে এই লোকের। তখন পত্রিকায় দু'জনের ছবি ছাপা হয়েছিল। সে জন্যে প্রথম থেকে একে পরিচিত মনে হয়েছে ওদের। এবার তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত ওরা। এ মুরগি-ছিলা হেক্টরই।

কোনও সন্দেহ নেই।

'তা হলে ওই লোককে চেনো, ছোকরা?' কিশোরের কাছে জানতে চাইল লোকটা।

কেউ যাতে বেফাঁস কিছু বলে না বসে, সে জন্যে এরই মধ্যে

তাকে আড়াল করে বন্ধুদের চোখ টিপে সতর্ক করে দিয়েছে কিশোর।

'মানে ওদিকের কোথাও একটা বাড়ির গেটে খুব সম্ভব ওই নামের একটা নেমপ্লেট দেখেছি আমি,' নরম সুরে বলল কিশোর।

'ম্যাজিস্ট্রেট থাকে কিলনার বিচে,' মুরগি-ছিলা হেক্টর সন্দিগ্ধ গলায় বলল। 'দেখে থাকলে সেখানেই দেখেছ। তার মানে তুমি কিলনারে যাও?'

মুসা কিছু বলবে, কিন্তু কিশোর সময়মত জুতোর ডগা দিয়ে গোড়ালিতে হালকা এক লাথি মেরে বসতে মুখ বুজে ফেলল।

সেদিকে নজর না দিয়ে সামনে চাইল কিশোর। ভয়ঙ্কর লাল চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে লোকটা।

'স্কুল না থাকলে সাইকেল নিয়ে এসব এলাকায় ঘুরি আমরা।'

'তাই বলো,' সমঝদারের মত মাথা দোলাল হেক্টর।

'কাসলার না কার কথা যেন বললেন তখন?' বলল কিশোর। 'আপনার কী করেছে লোকটা?'

'বললাম না গুলি করেছে? জামিন পেয়ে বাড়ি গেলাম। আজ সকালে ঘর থেকে বেরোতেই কাসলার গুলি করল,' ইঙ্গিতে ডান কাঁধের ব্যাণ্ডেজ করা জায়গাটা দেখাল। 'এই যে, এখানে।'

'তারপর?' সুবোধ বালক হয়ে গেছে কিশোর।

'জান বাঁচানোর জন্যে দৌড় দিলাম। কাসলার হারামজাদা পিছন থেকে গুলি করতে করতে...' থেমে গেল লোকটা। রাগ প্রকাশ করতে গিয়ে ডান হাত মুঠো করে বাঁ হাতের তালুতে ঘুসি মেরে বসল। পরক্ষণে ক্ষতস্থানে ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল।

'ওই হারামজাদা অন্তত আরও পাঁচটা গুলি করেছে পিছন থেকে,' ব্যথা সামলে নিয়ে আবার মুখ খুলল মুরগি-ছিলা হেক্টর। 'কিন্তু লাগাতে পারেনি। জান বাঁচাতে মরগান কমিশনারের বাসায় গিয়েছিলাম আশ্রয় নিতে, হারামজাদা দরজাই খুলল না।'

'তারপর?'

'তারপর দেয়াল টপকে তার বাড়ির পিছনদিকে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার আগেই...'

'কী?' কিশোর বলল।

'আবার গুলি করল কাসলার। দেয়ালের ওপর থেকে পড়ে গেলাম আমি। তারপর... তারপর আর কিছু মনে নেই।'

চুপ করে থাকল ওরা। কারও মুখে কথা নেই। বাইরে আগের মতই ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সেই সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাস। খোলা দরজা দিয়ে আসা বৃষ্টির ছাঁটে মর্গের মেঝের অনেকখানি জায়গা ভিজে গেছে।

মুরগি-ছিলা হেক্টরের ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস শুনে কিশোর-রবিন ও মুসা চেয়ে রইল। লোকটার চেহারা বদলে গেছে। আগের সেই গল্প করার ভাব উধাও হয়ে গেছে।

'কয়টা বাজে?' জানতে চাইল সে।

'প্রায় এগারোটা,' হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে কিশোর বলল। পরক্ষণে আঁতকে উঠল। সর্বনাশ! এত রাত হয়ে গেছে? এখনও বৃষ্টি কমার কোনও লক্ষণ নেই। কপালে আজ নির্ঘাত চাচীর বকা!

'এগারোটা, না?' বলল লোকটা। হুপিং কাশিতে আক্রান্ত রোগীর মত বিচ্ছিরি শব্দে হেসে উঠল। 'ভাল, ভাল। এখনই বের হতে হবে আমাকে।'

'কোথায় যাবেন?'

দাঁত বের করে ওদের তিনজনকে দেখে নিয়ে বলল হেক্টর, 'এখনও বুঝতে পারোনি? তা হলে এতক্ষণ কী শুনলে? এখন আমি প্রতিশোধ নিতে যাব। এক এক করে সবক'টাকে শেষ করব আজ।'

ওদের দিকে এক পা এগোল সে, পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল সবাই। 'কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'কারও সাধ্য নেই আমাকে ঠেকায় আজ। কারও সাধ্য নেই!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে মুরগি-ছিলা হেক্টর, যেন হাঁটায় অভ্যস্ত নয়। ঠোঁট স্থায়ীভাবে হাসির ভঙ্গিতে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু ওটা হাসি নয়, আক্রোশের অভিব্যক্তি।

'কেউ যদি আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায়, তা হলে...' ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করল না সে।

'আমি...' ঢোক গিলল কিশোর। 'আমরা আপনাকে বাধা দেব না।'

যুবকের কানে যেন গেল না কথাটা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু একটু টলছে। ঘন ঘন এদিক-ওদিক চাইছে, কিছু খুঁজছে যেন ব্যস্ত হয়ে। বিদ্যুৎ চমকের আলো মুখের উপর পড়লে ভয়ঙ্কর লাগছে তাকে। মনে হচ্ছে একটু পর পর তার মুখের চামড়ার নীচে ফসফরাসের আলো জ্বলে উঠেই আবার নিভছে।

'কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে!' আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কারও সাধ্য নেই... একটা অস্ত্র চাই! একটা অস্ত্র দরকার ওদেরকে জনমের শিক্ষা দিতে!'

থেমে গেল আচমকা। মাঝের খোলা দরজা দিয়ে ওপাশের ঘরে চোখ পড়েছে। স্থির হয়ে গেল লোকটা। ওই ঘরে একমাত্র টেবিলের উপরকার বড় স্টেইনলেস স্টীলের ট্রে-র উপর সাজিয়ে রাখা দেহ কাটাছেঁড়ার ছুরি। ট্রে-র উপর নজর লেপ্টে আছে তার। কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে নড়ে উঠল সে।

খ্যাকখ্যাক করে হাসল। 'পেয়েছি!' বলতে বলতে দ্রুত পা বাড়াল পাশের ঘরের দিকে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে। লোকটা মাঝের দরজা অতিক্রম করতেই নড়ে উঠল কিশোর, কিন্তু মুরগি-ছিলাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে জমে গেল।

ঘুরে দাঁড়াল সে, ওর উদ্দেশে বলল, 'এদিকে এসো তোমরা!'

'কেন?' কিশোর বলল।

'এসো, একটা জিনিস দেখে যাও।'

বাধ্য হয়ে পা বাড়াল কিশোর। ওর দেখাদেখি রবিন-মুসাও এগোল। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল হেক্টর, ওদেরকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে একটু সরে দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর-রবিন-মুসা। এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

'কী দেখব?' প্রশ্ন করল কিশোর।

জবাব না দিয়ে দুই পা এগোল মুরগি-ছিলা হেক্টর, লম্বা হাত

বাড়িয়ে ট্রে-র উপর থেকে দুটো বড় ছুরি তুলে নিল চট করে।

'কী করছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

উত্তর দেয়ার দরকার মনে করল না সে। শার্ট তুলে একটা ছুরি কোমরে গুঁজে রাখল। তারপর অন্যটা হাতে রেখে মুখ তুলে হাসল। চেহারায় সন্তোষ ও তৃপ্তি।

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'কী?'

ঘুরে দরজার দিকে এগোল সে। 'আমি চললাম। তোমরা যাতে ঝামেলা করতে না পারো, সে জন্যে এই রূমে আটকে রেখে যাচ্ছি তোমাদেরকে। চলি।'

তিন

যেন এতক্ষণে হুঁশ ফিরল মুসা ও রবিনের। লোকটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল দু'জনে। কী ভাবে এই সাক্ষাৎ জিন্দালাশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সেজন্য ব্যস্ত হয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কিশোর।

কিন্তু কোনও পথ দেখতে পাচ্ছে না। কেউ যদি এসে পড়ত এখন, বড় ভাল হতো। আড়চোখে দরজার দিকে চাইল কিশোর। দেবে নাকি দৌড়? খিচে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দেখবে নাকি?

কিন্তু ঠিক হবে না বোধহয়। যত চেষ্টাই করুক, তিনজনে একসঙ্গে পালাতে পারবে না ওরা, কাউকে না কাউকে ঠিকই ধরে ফেলবে মুরগি-ছিলা।

তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। চরম কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে।

কিন্তু তাই বলে চুপ করে থাকাও তো যায় না।

কী করা যায়?

কী করলে সবদিক রক্ষা হয়?

হঠাৎ করে জিনিসটার উপর চোখ পড়ল কিশোরের। ওরা তিনজন

যেখানে দাঁড়িয়েছে, তার কাছেই দেয়ালের সাথে খাড়া করে রাখা একটা স্ট্রেচার। ধাতব ফ্রেম ওটার।

জিনিসটা দেখেই মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর।

এত বড় একটা হাসপাতালের মর্গ এটা, ভাবছে কিশোর। কেউ কি নেই এটার দেখাশোনার জন্যে? থাকলে কোথায় সে? এতক্ষণেও কারও দেখা নেই, এ কেমন কথা?

বৃষ্টির কারণে বাইরের কেউ না হয় আসছে না, বা আসতে পারছে না, কিন্তু মর্গের কেয়ারটেকার গোছের কেউ একজন তো অবশ্যই আছে। সে কোথায় গেল? মানুষ এত দায়িত্বজ্ঞানহীন হয় কী করে?

ঝড়ের গতিতে কয়েকটা চিন্তা খেলে গেল ওর মনে, কিন্তু তা সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে। পরক্ষণে স্ট্রেচারটা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল কিশোর, এক ঝটকায় জিনিসটা দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুটে গেল লোকটার দিকে। সে তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কিশোরকে স্ট্রেচার বাগিয়ে ছুটে আসতে দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা, তারপরই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হাতের ছুরিটা তুলে তেড়ে এল ওর দিকে।

কিশোরের বুক কেঁপে উঠল ভয়ে। কিন্তু থামল না, ছুরিটার উপর সতর্ক চোখ রেখেছে। কয়েক হাত দূর থেকে স্ট্রেচারের এক মাথা দিয়ে জোরে গুঁতো মেরে বসতে চাইল লোকটার পেটে।

ওটার দু'দিকে ধরার জন্য দেড় ফুট লম্বা দুটো হাতল। তার একটা গিয়ে লাগল লোকটার ডান উরুতে, অন্যটা পাঁজরে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল মুরগি-ছিলা হেক্টর। পাঁজর চেপে ধরে পিছিয়ে গেল এক পা। ছুরি ফেলে দিয়েছে।

'রবিন! মুসা! দৌড় দাও! বেরিয়ে যাও ঘর থেকে!!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

যথেষ্ট হয়েছে বুঝে স্ট্রেচার ফেলে নিজেও ঝেড়ে দৌড়াতে চাইল ও, কিন্তু পারল না।

যতখানি ভেবেছে, ততটা কাহিল হয়নি মুরগি-ছিলা হেক্টর। ওকে লাফ দিতে দেখে নিজের ব্যথা ভুলে সে-ও লাফ দিল, কাঁচ বেঁধা হাতে খপ করে চেপে ধরল কিশোরের একটা হাত।

আতঙ্কে শিউরে উঠল কিশোর।

মরা মানুষের মত ঠাণ্ডা লোকটার হাত।

নাড়ি দিয়ে রক্ত চলাচল করছে বলে মনে হলো না।

ঘুরল কিশোর। সেকেণ্ডের জন্য চোখাচোখি হলো লোকটার সঙ্গে। সেখানেও প্রাণের কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না।

ঘষা কাঁচের মত চোখ মরা মানুষের।

হাত ছাড়াবার জন্যে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করল কিশোর। কিন্তু কাজ হলো না। একচুল আলগা হলো না হেক্টরের বজ্রমুঠি।

কিন্তু কিশোর মরিয়া। উপায় না দেখে লোকটার চোখে খোঁচা দিতে গেল। হেক্টরের চোখের ঠিক পাশে খামচি পড়ল।

আঁউ বলে চেঁচিয়ে উঠল সন্ত্রাসী। এক হাতে চোখ ঢেকে ফেলেছে। কিশোরকে ধরে থাকা হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেছে আপনাআপনি।

এবার ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল কিশোর। সামনের ঘরে এসে দুই ঘরের মাঝখানের দরজা লাগিয়ে দিল দ্রুত।

ওপাশে ক্রুদ্ধ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরগি-ছিলা। দমাদম কিল মারতে লাগল। কিন্তু কিশোর এদিক থেকে এক ঝটকায় ছিটকিনি তুলে দিল।

ব্যস, ঝামেলা ডিসমিস।

ওদিকে রবিন ও মুসা সামনের দরজার কাছে পৌছে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রয়োজন পড়লে আরেকবার এক শ' মিটার স্প্রিন্ট দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু তার আর দরকার নেই দেখে দ্রুত কিশোরের কাছে ফিরে এল দু'জন।

কিশোর ফিরে চাইতেই জানতে চাইল মুসা, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ,' বিরাট একটা শ্বাস ফেলল কিশোর। বুকের ধড়ফড়ানি

এখনও থামেনি। কত বড় ঝুঁকি নিয়েছে, সে ভেবে এখনও একটু একটু কাঁপছে।

'ওফ্, যা দেখিয়েছ না!' প্রশংসা ঝরে পড়ল মুসার কণ্ঠে। 'একেবারে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে লোকটার। কিন্তু... এখন কী করা যায় লোকটার ব্যাপারে?'

'পুলিশে খবর দিলে ভাল হয়,' রবিন পরামর্শ দিল।

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল মুসা। 'পুলিশকে জানানো দরকার। এখানে এসে যা করার তারা করবে।'

অন্যমনস্কের মত মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সে না হয় হলো, কিন্তু আমি ভাবছি ব্যাপারটা কী হলো! একটা মৃতদেহ হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠে এত কিছু ঘটাল, এ কী করে সম্ভব?'

'আমার মনে হচ্ছে এটা কোনও দুঃসপ্ন,' রবিন বলল নিচু গলায়। 'যে-কোন সময়ে জেগে উঠে দেখব এসব মিথ্যে।'

ওদিকে হেক্টরের লাফঝাঁপ আগেই থেমে গেছে। এখন আর চেঁচাচ্ছে না সে। চুপ করে আছে। রহস্যময় নীরবতা দরজার ওপাশে।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'তাই যদি হত!' বলে ঠোঁটে জোরে চিমটি কাটল। কী নিয়ে যেন ভাবতে চাইছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'না, এ স্বপ্ন নয়, সত্যি।'

মুসা ভাবছে, যদি এখন ঘুম ভেঙে যেত, চোখ মেলে বাড়িতে, নিজের বিছানায় দেখতে পেত নিজেকে, বড় ভাল হত। যদি...

রবিনের প্রশ্নে বাস্তবে ফিরে এল মুসা। 'কীসের শব্দ?' চমকে উঠে বলেছে নথি।

'কোথায়?' ঘুরে চাইল কিশোর।

'ও-ঘরে!' মাঝের বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে দিল মুসা।

দরজায় কান পাতল কিশোর। ঝড়-বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ এল। সাথে ঘরঘর শব্দ। অনেকটা বুকে কফ আটকে যাওয়ার মত।

অনেকক্ষণ চলল ঘড়ঘড়ানি, তারপর থেমে গেল আচমকা।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল তিন গোয়েন্দা।

'এতক্ষণে মনে হয় মরেছে,' মুসা ফিসফিস করে বলল।

'চল, কেটে পড়ি!' রবিন বলল। 'পুলিশে খবর দিয়ে বাড়ি ফিরতে কত সময় লাগবে, কে জানে!'

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল মুসা, 'কেন যে আজ আসতে গিয়েছিলাম!'

কিশোর বলে উঠল, 'লোকটার কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছ?'

'না!' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জবাব দিল মুসা। 'হলো কী? একদম ঠাণ্ডা মেরে গেল যে!'

'দরজা খুলে দেখব নাকি?' কিশোর বলল।

'কিন্তু দরজা খুললে যদি পালিয়ে যায় ব্যাটা?' বলল মুসা।

'আমরা তিনজন আর ও একা। তার ওপর দুর্বল। কিছু হবে না। এক পলক দেখে বন্ধ করে দেব দরজা।'

নিঃশব্দে প্রস্তুত হয়ে নিল ওরা। ছিটকিনি খোলার জন্যে হাত তুলল কিশোর। রবিন ও মুসা পরিকল্পনা অনুযায়ী দরজার দুই পাল্লার সামনে দাঁড়াল, বিপদ দেখলে লাগিয়ে দেবে কপাট। কিশোর ছিটকিনি তুলে দেবে।

একটুও শব্দ না করে ওটা খুলল কিশোর, পাল্লা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল। পরক্ষণে বোকা হয়ে গেল সামনের দৃশ্য দেখে।

ঘর শূন্য।

কেউ নেই ভিতরে। তার ওপাশে মরচে ধরা গ্রিল বেঁকে আছে বাইরের দিকে।

ওই পথে বেরিয়ে গেছে মুরগি-ছিলা হেক্টর।

কখন, আল্লাহ মালুম।

চার

বুদ্ধু বনে গেল তিন গোয়েন্দা। বেকুবের মত একে অপরের দিকে চাইল।

কখন পালাল লোকটা?

কখন?

কতক্ষণ আগে?

প্রতিশোধ নেয়ার পথে কতদূর এগিয়ে গেছে?

প্রথমে কার উপর চড়াও হবে হেক্টরের লাশ?

সত্যিই কি লোকটা প্রতিশোধ নেবে? না মিথ্যে হুমকি দিল?

কিশোরের কাছে মিথ্যে মনে হলো না।

লোকটাকে যে রকম মরিয়া দেখা গেছে, তাতে যা খুশি তাই করে বসতে পারে সে এখন।

মরিয়া হয়ে উঠলে মানুষ পারে না এমন কাজ নেই।

'সর্বনাশ!' মুসা বলল। 'এখন কী হবে?'

'তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দেয়া উচিত আমাদের,' রবিন বলল। 'খবর পেলে ওরা তাড়া করে ধরতে পারবে লোকটাকে।'

হঠাৎ কী মনে হতে ভীষণ চমকে উঠল কিশোর। চেহারা দেখে মনে হলো যেন হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের শক খেয়েছে। 'শ্যারন!'

ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'শ্যারন! তার আবার কী হলো?'

'সর্বনাশ!' প্রায় ফিসফিস করে বলল কিশোর, মুসার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

'কীসের সর্বনাশ? কী বলছ তুমি, কিশোর?'

'আজ রাতে শ্যারন তার বড় চাচার বাসায় থাকবে, ভুলে গেছ?' কিশোর বলল।

'তা থাকুক,' মুসা বলল। 'তাতে কী?'

'হ্যাঁ, তাতে কী?' রবিন সায় দিল ওর কথায়।

'আরে, শ্যারনের এই চাচাই তো ম্যাজিস্ট্রেট গোলান রব। মুরগি-ছিলার তিন টার্গেটের মধ্যে তিনিও একজন।'

মুখ কালো হয়ে গেল মুসার। 'হ্যাঁ, তাই তো!'

ব্যস্ত হয়ে উঠল কিশোর, 'এখন যদি ওই বাড়িতে গিয়ে ওঠে লোকটা?'

'খাইছে!' মুসা বলল। 'জলদি চলো। তাড়াতাড়ি পৌছতে না

পারলে না জানি কী ঘটিয়ে বসবে!'

'দাঁড়াও,' কিশোর বলল। 'হয়তো পৌছতে দেরি হয়ে যাবে আমাদের। তারচেয়ে ফোন করতে পারলে ভাল হয়।'

'ঠিক,' রবিন বলল। 'কিন্তু ফোন কোথায় পাই এখন?'

'ফোন? ওই তো ফোন!' উল্লসিত কণ্ঠে বলল মুসা।

'কোথায়!' বিস্মিত হলো কিশোর। মুসার আঙুল অনুসরণ করে দেখল যে টেবিলে ট্রে-র উপর যন্ত্রপাতি সাজানো, সেই টেবিলের উপর রাখা আছে লাল রঙের টেলিফোন। এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি জিনিসটা।

দৌড়ে গিয়ে ওটার রিসিভার তুলল মুসা। কানে লাগিয়ে দেখল ডায়াল টোন আছে।

আগে কোথায় ফোন করবে ভেবে দ্বিধায় পড়ে গেল।

পুলিশে?

নাকি শ্যারনের আঙ্কেল ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায়?

পুলিশেই ফোন করার সিদ্ধান্ত নিল। টেলিফোনের পাশে রাখা ডিরেক্টরি ঘেঁটে গোল্ডেন বিচ পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ফোন নম্বর বের করে দ্রুত বোতাম টিপতে লাগল।

'কোথায় করছ ফোন?' কিশোর জানতে চাইল।

'পুলিশে।'

'আগে শ্যারনের চাচার বাসায় করছ না কেন?'

'পরে করছি। আগে পুলিশকে জানাই। ওঁরাই ভাল সামলাতে পারবেন এসব। গাড়ি নিয়ে ওই বাড়িতে পৌছে অপেক্ষা করবেন, লোকটা গেলেই ঘাড় চেপে ধরবেন।'

'ঠিক আছে, পুলিশকে জানাও।'

'হ্যালো! গোল্ডেন বিচ পুলিশ কন্ট্রোল রুম?' গলা নামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল মুসা। 'হ্যাঁ, শুনুন, আমি একটা রিপোর্ট করতে চাই। এক খুনি পালিয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন?'

খানিক নীরবতা।

'লোকটা,' আবার শুরু করল মুসা। 'লোকটা... কী বললেন? ও

হ্যাঁ, আমার নাম মুসা আমান। তিন গোয়েন্দা আমরা। অ্যাঁ? হ্যাঁ। মুসা আমান। আমার ঠিকানা? শুনুন, এ মুহূর্তে আমি রকি বিচ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে বলছি।'

আবার কয়েক মুহূর্ত বিরতি।

'জ্বি? না, আমি হাসপাতালের কেউ নই। ...না, চাকরিও করি না এখানে। আমি আসলে এক রোগী দেখতে এসেছি। বৃষ্টিতে আটকে গেছি। না, না। সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়। বিশ্বাস করুন! শুনুন! রকি বিচ মেডিক্যালের মর্গ থেকে বলছি। এখানে একটা লাশ ছিল। হঠাৎ করে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ওটা!'

কিছু সময়ের বিরতি।

কানের সাথে রিসিভার ঠেসে ধরে শুনছে মুসা। 'না, না! বিশ্বাস করুন! একটুও মিথ্যে বলছি না। দেখুন, আমরা তিন গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।'

'কীসের গোয়েন্দা বললে?' ও-প্রান্ত থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

'তিন গোয়েন্দা। বোধহয় শুনেছেন আমাদের কথা।'

'না তো, শুনিনি! দুষ্টুমি করছ কেন, ছোকরা!'

'দুষ্টুমি করছি না আমরা। খুব জরুরি কাজে ফোন করেছি। আমার রিপোর্ট দয়া করে মন দিয়ে শুনুন। গোল্ডেন বিচ এলাকার নামকরা এক সন্ত্রাসী, মুরগি-ছিলা হেক্টর...'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিল অপর প্রান্তের লোকটা। 'ও-ও, হেক্টর? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে তো আজ মেরে ফেলেছে ড্রাগ লর্ড কাসলার।'

'হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি। একটু আগে এখানকার মর্গে ছিল তার লাশ। কিন্তু হঠাৎ করে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে সে...'

'কী নাম যেন বললে তোমার?'

'মুসা আমান।'

'লেখাপড়া করো তুমি?'

ভুরু কুঁচকে উঠল মুসার। 'হ্যাঁ, স্কুলে পড়ি, কেন?'

'না। ভাবছি এই বয়সেই নেশা ধরেছ!'

'কী বললেন?'

'আরে ছোকরা, কথা কম বোঝো, না?' কড়া গলায় বলল লোকটা। 'পকেটে টাকা থাকলে গাঁজা, হেরোইন, প্যাথেড্রিন যা খুশি খাও। কিন্তু সময়ে-অসময়ে ফালতু কথা বলে পুলিশের সঙ্গে মশকরা করতে এসো না। বিপদে পড়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ?'

রেগে উঠল মুসা। 'দেখুন...'

'দেখেছি। এবার তুমি ফোন রাখো। খামোকা পয়সা নষ্ট করছ, ছোকরা!'

'আপনি... আপনি ভুল করছেন!' গরম স্বরে বলল মুসা। 'আপনার কারণে তিন তিনটে মানুষ আজ রাতে খুন হয়ে যেতে পারে। বুঝতে পেরেছেন? যদি সে রকম কিছু ঘটে, তা হলে আপনাকে আমরা ছড়ব না, মনে রাখবেন।'

ওদিক থেকে একটা গালি ভেসে এল। দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল মুসা। রাগে ফুঁসছে। ওই লোক ওকে ফালতু ছোকরা মনে করেছে!

'লোকটা উজবুক?' ওর রাগ দেখে বলল কিশোর।

মুসা বলল, 'কিছুই বিশ্বাস করানো গেল না। সে ভাবছে আমি গাঁজা খেয়েছি। ঠিক আছে, ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই।' হতাশ চেহারার রবিনের উদ্দেশে বলল, 'দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও, দেখি কী করা যায়।'

'আসলে তুমি একটা মারাত্মক ভুল করেছ,' বলল কিশোর।

'ভুল!' ভুরু কুঁচকে চাইল মুসা। 'কীসের ভুল?'

'একটা মরা মানুষ বেঁচে উঠেছে, এ কথা পুলিশকে বলা ঠিক হয়নি। নইলে হয়তো অবিশ্বাস করত না ওরা।'

মারাত্মক ভুলটা বুঝে গম্ভীর হয়ে গেল মুসা। 'যাহ! তা-ই তো! তাড়াতাড়ি করে বলতে গিয়ে একটুও খেয়াল ছিল না।'

'যা হওয়ার হয়ে গেছে,' বলল রবিন। 'এখন আফসোস করে লাভ নেই।'

গম্ভীর কিশোর মুসার হাত থেকে রিসিভার নিল। রকি বিচ পুলিশ

হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করল এবার। ডিউটি অফিসারকে সংক্ষেপে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিল। এবার অপমানিত হতে হলো না ওদেরকে। ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানিয়ে রেখে দিলেন ফোন।

কিন্তু আসল বিষয়, হেক্টরকে ধরবার যে আশা ছিল ওদের, তা হবে না। যা করবার করবে পুলিশ। সঙ্গে নেবে না ওদেরকে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর, হাল ছাড়বে না। এই কেস ওদের। ভাবতে শুরু করল, খুনিটা এতক্ষণে কতদূর গেছে।

'এখন আগে শ্যারনকে সতর্ক করা দরকার, তারপর অন্যদের কথা ভাবব।' রিসিভার আবারও তুলে নিল কিশোর। অবশেষে পাঞ্চিং শেষ হলো। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল। ব্যস্ততা জানান দিচ্ছে ফোন।

এনগেজড।

চেহারা শুকিয়ে গেছে কিশোরের। ক্রেডল চেপে লাইন ক্লিয়ার করে আবার পাঞ্চ করল।

এবারও বিজি টোন এল।

'এই শ্যারনটা বান্ধবীদের সঙ্গে এত কথা যে বলতে পারে!' চিন্তিত গলায় বলল কিশোর।

'কী হলো?' প্রশ্ন করল মুসা, মুখে চাপা শঙ্কা। 'এনগেজড?'

'হ্যাঁ,' আরও কয়েকবার ডায়াল করল কিশোর।

ফলাফল একই হলো। ভাঙা ভাঙা ডায়াল টোন বাজছে তো বাজছেই।

সময় নষ্ট হচ্ছে।

চরম বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

হঠাৎ অন্য একটা কথা খেয়াল হলো কিশোরের। বলল, 'আমার সন্দেহ— এনগেজড না, লাইনটাই নষ্ট।'

'কী করে বুঝলে?' মুসা প্রশ্ন করল।

'বুঝিনি। এমনিই বলছি, আন্দাজে। এরকম প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির সময় ফোনের লাইন প্রায়ই বিকল হয়। আমাদের ওদিকে তো সবসময় এরকম হয়। আজকেও হয়তো...' থেমে হাতঘড়ি দেখল কিশোর। 'তা ছাড়া, রাত কত হয়েছে দেখেছ? এমন ওয়েদারে এত রাত পর্যন্ত কেউ

জেগে থাকে?'

'তাই তো!' বলল রবিন।

মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভয়ঙ্কর রকম তীব্র, নীলচে আলো ঝলসে উঠতে তাড়াতাড়ি কানে হাত চাপা দিল। মুহূর্তের জন্যে দিনের মত আলো হয়ে উঠল চারদিক।

পর মুহূর্তে দুনিয়া কাঁপানো বিকট শব্দে ধারে-কাছেই কোথাও পড়ল বাজ। ঝনঝন করে কেঁপে উঠল মর্গের প্রতিটা জানালার কাঁচ। কেঁপে উঠল ওরা তিনজনও। কড়কড় গুমগুম করতে করতে দূরে মিলিয়ে গেল বজ্রপাতের রেশ।

'হুস!' করে চেপে রাখা দম ছাড়ল মুসা। 'ওটা যদি মুরগি-ছিলার মাথায় পড়ে, সকালে খবর পাব।'

'বেচে গেল তোমার মুরগি-ছিলা,' বলল রবিন।

'মানে?' মুসা ঘুরে চাইল।

'মানে, ওটা মুরগি-ছিলার মাথায় পড়েনি।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'ওই দেখো,' জানালা দিয়ে দূরের একটা পাম গাছ দেখাল রবিন। 'আগুন দেখতে পাচ্ছ ওটার মাথায়? ওখানে পড়েছে বাজটা।'

সত্যিই তাই। হাসপাতালের কাছেই গাছ। মাথায় একটু একটু আগুনের আভাস দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টির তোড়ে বাড়তে পারছে না। কিন্তু ধোঁয়া উঠছে ওটার চাঁদি থেকে।

সমস্যার দিকে মন দিল কিশোর। ফোন তুলে আরও কয়েকবার চেষ্টা করল শ্যারনের নম্বরে। কাজ হলো না। এবার সবার স্থির বিশ্বাস জন্মাল ফোনটা আসলেই নষ্ট। কেবল ডাউন না কী বলে, তা-ই ঘটেছে ওদিকে।

জানে লাভ নেই, তবু ডিরেক্টরি ঘেঁটে ওদের এলাকার কমিশনারের ফোন নম্বর খুঁজে বের করল নথি। দ্রুত পাঞ্চ করল নম্বর।

ওকে অবাক করে দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোন। বিজি নয়, ইজি টোন। কিরকির আওয়াজ করছে।

'পেয়েছি!' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রবিন। কিশোরের হাতে

দিল রিসিভার।

কারও রিসিভার তোলার অপেক্ষা করছে কিশোর।

বেজে চলেছে রিং।

তিনবার....

পাঁচবার...

সাতবার...

ধরছে না কেউ। কেউ একজন ধরুন, মনে মনে বলল কিশোর। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ!

নবম রিং শেষ হওয়ার সামান্য আগে ও-প্রান্তে খুট-খাট আওয়াজ উঠল, কেউ হাই তুলল শব্দ করে। তারপর একটা নারী কণ্ঠ সাড়া দিল। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'হ্যালো!'

কিশোর বলল, 'মিস্টার মরগান আছেন বাসায়?'

'আপনি কে?'

'আমার নাম কিশোর। প্লিজ, ওঁকে একটু ডেকে দিন। খুব জরুরী দরকার।'

'কোত্থেকে বলছ তুমি?' মহিলার মধ্যে কোনও ব্যস্ততা নেই। একদম ধীর-স্থির কণ্ঠ।

'রকি বিচ মেডিক্যাল কলেজ থেকে।'

'মানে হাসপাতাল থেকে?'

'জ্বি, জ্বি। প্লিজ, ওঁকে একটু ডেকে দিন। খুব জরুরী।'

'কিন্তু এখন তো ডাকা যাবে না। এইমাত্র ঘুমিয়েছেন উনি।'

'দেখুন, সমস্যাটা ওঁর, তাই ওঁকেই দরকার আমার। দেরি করলে মস্ত বিপদ...'

'বিপদ! কীসের বিপদ? কী বলছ তুমি?' এবার একটু বিরক্ত, অসহিষ্ণু হয়ে উঠল কণ্ঠটা। 'তুমি আসলে কে?'

'আমি আপনাদের পাশের ওয়ার্ডে থাকি। রকি বিচ হাই স্কুলে পড়ি।'

'স্কুলে? অ! কোন ক্লাসে?'

'সেটা মূল বিষয় নয়।'

'আচ্ছা! তা কী বিপদের কথা যেন বলছিলে? খুলে বলো।'

লম্বা করে দম নিল কিশোর। 'আপনি কি ডেকে দেবেন ওঁকে?'

'উম্‌ম্! এখনই বলতে পারছি না। আগে ঘটনা খুলে বলো আমাকে, তারপর ভেবে দেখব।'

অনেক কষ্টে রাগ সামলে রাখল কিশোর। ভাবল, কেন যে মানুষ বিপদের গুরুত্ব বুঝতে চায় না! 'বেশ, বলছি। আপনি মুরগি-ছিলা হেক্টরের নাম শুনেছেন?'

'মুরগি-ছিলা হেক্টর? হ্যাঁ, শুনব না কেন? কিন্তু ও তো বেঁচে নেই। আজ সকালে মারা গেছে। মানে মেরে ফেলা হয়েছে তাকে। কিন্তু ওর কথা কেন?'

'ব্যাপারটা আপনাকে যে কীভাবে বোঝাব, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। সবাই একই কথা বলছে। বলছে, লোকটা মরে গেছে। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'কিন্তু আমরা দেখেছি সে বেঁচে আছে।'

'তার মানে?' বিস্মিত হলো মহিলা। 'মরা মানুষ আবার বেঁচে ওঠে কী করে? কী বলো তুমি?'

'সে প্রশ্ন তো আমারও। কিন্তু ঘটনা সত্যি।'

'কী সব আবোল তাবোল বলছ?' গলা তেতে উঠল মহিলার। 'রাত দুপুরে মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে এ কোন ধরনের অসভ্যতা?'

'শুনুন, আপনি ভুল বুঝছেন। আমি চেষ্টা করছি মিস্টার মরগানকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে। কিন্তু আপনি...'

'আরে কীসের বিপদ? কোথায় বিপদ? মরা মানুষ...'

'হেক্টর মরেনি, বেঁচে আছে,' শান্ত স্বরে বলল কিশোর। 'একটু আগে এখানকার মর্গ থেকে বেরিয়ে গেছে লোকটা। প্রতিশোধ নিতে গেছে বিপদের সময় কমিশনার তাকে আশ্রয় দেননি বলে।'

'দেখো ছেলে, অনেক হয়েছে ঠাট্টা। এবার...'

'আমি ঠাট্টা করছি না। মুরগি-ছিলা হেক্টর...'

'ফের এক কথা!' এবার ধমকে উঠল মহিলা।

প্রায় একই মুহূর্তে দূরাগত অস্পষ্ট দুটো শব্দ শুনতে পেল কিশোর। একটা ঘুমজড়ানো, মোটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'কে ফোন করেছে? কার সাথে রাগারাগি করছ?'

মহিলাকেই করা হয়েছে প্রশ্নটা, বুঝল কিশোর। কিন্তু জবাব দেয়ার সময় পেল না সে, তার আগেই দড়াম করে দরজা খোলার শব্দ উঠল। একই সঙ্গে মহিলার তীক্ষ্ণ গলা চিৎকার দিয়ে উঠল। একটা আতঙ্কিত পুরুষালী গলাও কানে এল কিশোরের।

'অ্যাই! কে-ক কে তুমি! এ ঘরে ঢুকলে...' সশব্দে আঁতকে উঠে থেমে গেল গলাটা। 'তুমি!! মানে!!!'

পর মুহূর্তে প্রাণপণে 'বাঁচাও!' বলে চেঁচিয়ে উঠল পুরুষ কণ্ঠ।

'এখন কেউ বাঁচাতে পারবে না তোমাকে, শয়তানের বাচ্চা!' মুরগি-ছিলা হেক্টরের গলা একদম স্পষ্ট শুনতে পেল কিশোর। মহিলার সাড়া শব্দ নেই, খুব সম্ভব জ্ঞান হারিয়েছে।

'সকালে আমিও তোমার কাছে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিতে এসেছিলাম। তুমি দাওনি। এখন আমি তার প্রতিশোধ নেব। এবার বুঝবে কেমন লাগে!'

গোঁ-গোঁ করে কী যেন বলতে চেষ্টা করল প্রথম পুরুষ কণ্ঠ, কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল। তার বদলে একটা প্রলম্বিত মরণ চিৎকার শুনতে পেল কিশোর।

রিসিভার হাত থেকে পড়ে যেতে গেল, কিন্তু শক্ত করে ধরল কিশোর। মুসা আর রবিনের দিকে চাইল। চেহারা রক্তশূন্য।

'কী!' মুসা বলল। 'কী হয়েছে?'

'মুরগি-ছিলা হেক্টর মেরে ফেলেছে কমিশনারকে!' কোনওমতে বলল কিশোর।

'খাইছে!' বলল মুসা।

থমকে গেছে রবিন।

যে যার জায়গায় জমে গেল ওরা। যেন পাথরের মূর্তি। প্রাণ নেই।

কয়েক সেকেণ্ড পর আপনমনে বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'কিন্তু এই আবহাওয়ায় এত তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছল কী করে লোকটা!'

মুখে কথা নেই মুসা ও রবিনের।

খানিক পর রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর।

বিজি টোন আসছে।

কেটে গেছে লাইন।

পাঁচ

কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি তুলল রবিন, 'কিন্তু লোকটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ওখানে পৌঁছল কী করে?'

মুসা বলল, 'ডানা আছে নাকি?'

'আমাদেরও যাওয়া উচিত,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রবিন। 'জলদি যাওয়া উচিত আমাদের। কমিশনারকে সাহায্য...'

মাথা নাড়ল কিশোর হতাশ চেহারায়। 'এখন আর কোনও সাহায্য কাজে আসবে না তাঁর। অন্যদেরকে সাহায্যের চেষ্টা করতে পারি আমরা।'

'আরেকবার চেষ্টা করে দেখো, শ্যারনকে জানানো যায় কি না,' পরামর্শ দিল মুসা।

মাথা ঝাঁকিয়ে রিসিভার তুলল কিশোর। ওর কানে তখনও সেই মহিলা ও কমিশনারের আর্ত-চিৎকার ভাসছে।

আরেকবার শ্যারনকে ধরার চেষ্টা করল ও, কিন্তু ফলাফল একই। আগের মতই বিজি টোন আসছে। আগের সন্দেহ ফিরে এল মনে। নিশ্চয় শ্যারন ফোনে আড্ডা মারছে কারও সঙ্গে।

বৃষ্টির জন্যে ফোন নষ্ট হলে কমিশনারের ফোনও নষ্ট থাকত। কিন্তু তা হয়নি। তার মানে ওর সন্দেহ ঠিক। অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেট রবের ফোন আগে থেকেই নষ্ট থাকলে অন্য কথা।

'না, ফোনে পাব না!' বিরক্ত হয়ে ঠাস করে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। 'এখনও ফোন ছাড়েনি শ্যারন।'

'ও বাড়ির ফোন না নষ্ট?'

'মনে হয় না,' বলল কিশোর। কেন, সে কথাও খুলে বলল।

'তা হলে এর মধ্যে কোনও বিশেষ কারণ থাকতে পারে,' রবিন মন্তব্য করল।

'কী কারণ?' বলল মুসা।

'হয়তো পুরানো কোনও বান্ধবী বিদেশ থেকে ফোন করেছে।'

কিশোর বলল, 'তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের। চলো!'

দমে গেল রবিন। 'কিন্তু... বলছিলাম, শ্যারনকে ফোনে খবরটা দেয়া গেলে ভাল হতো। আমাদের পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে।'

'কতক্ষণ আর লাগবে?' বলল পালোয়ান মুসা। 'জোরে সাইকেল চালালে বেশিক্ষণ লাগবে না। চলো, চলো। দাঁড়াও, তার আগে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করে নিই।'

'অস্ত্র-শস্ত্র!' বিস্মিত হলো রবিন, 'সেসব কী কাজে?'

'কখন কী পরিস্থিতিতে পড়ব কে জানে, তাই সাবধানতার খাতিরে আর কী!' ট্রে থেকে বাছাই করে একটা ছুরি তুলে নিল মুসা। ওটা কোমরে গুঁজে বলল, 'তোমরাও নিয়ে নাও একটা করে।'

তা-ই করল কিশোর ও রবিন। টেবিলটার ড্রয়ার হাতড়ে একটা টর্চলাইট ও নাইলনের কিছু রশি পেল কিশোর। ওগুলোও সঙ্গে নিয়ে নিল।

বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে ঝেড়ে দৌড় দিল মূল ভবনের দিকে। হাসপাতাল ও মর্গ, এর মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট গজের মত ব্যবধান।

এইটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল ওরা।

এমন অসময়ে ওদেরকে হাসপাতালে দেখে ওয়ার্ড বয়, নার্স, সবাই বিস্মিত হলেও কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না।

ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডের সামনের করিডর ধরে পাশের উঠানে বেরিয়ে এল।

একবার কিশোর ভেবেছিল কাউকে মুরগি-ছিলার ঘটনাটা জানিয়ে

যাবে। কিন্তু পরে চিন্তাটা বাতিল করে দিয়েছে।

বিস্ময়-সন্দেহ-অবিশ্বাস-জেরা-সরেজমিন তদন্ত, ইত্যাদিতে প্রচুর সময় নষ্ট হবে। ওদের আসল উদ্দেশ্য ভেস্তে যাবে। তাই কিশোর চুপচাপ বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যে যার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

'প্রথমে কোথায় যেতে হবে?' রবিন প্রশ্ন করল। 'শ্যারনের চাচার বাসায়, নাকি...'

'না। কাসলারের খোঁজে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু লোকটা থাকে কোথায় তাই তো জানি না।'

'আমি মনে হয় জানি,' মুসা বলল।

'তা-ই নাকি?' কিশোর ঘুরে চাইল।

'না, মানে ঠিক জানি না। তবে একবার শুনেছিলাম সে কোন এলাকায় থাকে।'

'কোথায় থাকে?'

'গোল্ডেন বিচের একদম শেষ মাথায়।'

'চলো তা হলে,' কিশোর বলল। 'আগে ওখানেই যাব।'

মৃদু আপত্তি জানাল রবিন, 'আগে শ্যারনের চাচাকে সতর্ক করলে...'

'চিন্তা কোরো না। ওখানে আগে যাবে না হেক্টর। আগে যাবে ওর প্রাণের শত্রুর সাথে বোঝাপড়া করতে।'

'কী করে বুঝলে?' মুসা প্রশ্ন করল।

'বুঝিনি, আন্দাজ,' বলল কিশোর। 'তবে যুক্তি তা-ই বলে। ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর লোকটার রাগ পুরনো, কিন্তু কাসলারের ব্যাপারটা অন্যরকম। একদম তাজা ওটা। তাই আগে ওদিকেই যাবে হেক্টর।'

'চলো তা হলে।'

সাঁই সাঁই করে প্যাডেল মেরে এগিয়ে চলল ওরা। পানি জমে থাকা নির্জন রাস্তা ধরে চলেছে। কনসাল রোডে এসে উঠল। তারপর কলেজ এলাকা ছাড়িয়ে এসে কোর্ট হাউসকে পাশ কাটিয়ে কোনাকুনি ক্যারল রোডে এসে পড়ল। পাশে সাগর ও সৈকত রেখে পৌঁছে গেল

গোল্ডেন বিচে। গলিঘুঁচি পেরিয়ে ঠিক জায়গামত পৌছতে লাগল আধঘন্টা। মুসাকে অনুসরণ করে চলেছে এখন কিশোর ও রবিন। অবশেষে একটা সুরকি বিছানো রাস্তায় গিয়ে উঠল ওরা।

রাস্তাটা খুব সরু আর নোংরা। ল্যাম্পপোস্টে বাতি নেই। দু'একটায় যা-ও বা আছে, ভাঙা। লোক চলাচল একেবারে নেই। নির্জন। আজ এদিকটায় খুব শীত পড়েছে।

প্রবল বৃষ্টি প্রায় অচল করে রেখেছে জীবনযাত্রা। ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে বহুগুণ।

'আমার কী মনে হয়, জানো?' নীরবতা ভাঙল মুসা।

'কী?' কিশোর বলল।

'আসলে হেক্টর সত্যিই লাশ। একটা জিন্দালাশের সাথে কী পেরে ওঠা সম্ভব?'

'সম্ভব কি না জানি না। তবে সম্ভবত ও একজন মানুষকে খুন করেছে। আরও একজনকে করতে চলেছে। জেনে শুনে ওকে আমরা কাজটা করতে দিতে পারি না।'

রাস্তাটা কালিগোলা অন্ধকারে ঢাকা। ঘরবাড়িও তেমন নেই। এখানে-ওখানে দু'একটা ইঁট বেরিয়ে থাকা বাড়ি। চারপাশে ঝোপঝাড়। গরীব মানুষের এলাকা। রাস্তায় গোড়ালি সমান পানি।

একটা কুকুর হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। আরেকটু হলে রবিনের সাইকেলের নীচে চাপা পড়ত ওটা।

সামনে একটা সরু বাঁক। সেখানে একটা ছোট দোকান, ওটার সামনে ছাউনি। সেটার নীচে চেয়ার পেতে বসে এক লোক কফির কাপে সুড়ুৎ সুড়ুৎ চুমুক দিচ্ছে। মুখ-মাথা জড়িয়ে রেখেছে মাফলার দিয়ে। পরনে নোংরা একটা কোট। মাথার উপর ছাউনি রয়েছে বলে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে না গায়ে। এই আবহাওয়ায় এরকম প্রায় নির্জন জায়গায় এত রাতে খোলা কফির দোকান, অবাক হলো তিন গোয়েন্দা।

ওরা এগিয়ে গেল ওদিকে।

দোকানিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মিস্টার, এদিকে মিস্টার

কাসলারের বাসা কোনদিকে বলতে পারেন?'

নোংরা কোট পরা লোকটার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল দোকানি। তারপর এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল– জানে না।

'তা হলে তো মুশকিল হয়ে গেল!' হতাশ শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। এদিক-ওদিক চাইল। এদিকের সমস্ত দোকান-পাটের ঝাঁপ ফেলা। 'আমাদের কী!' একটু বেশি জোরে বলল। 'কাসলারের ভাগ্যটা খারাপ, আমাদের সঙ্গে তার দেখা হলো না। চলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

ওরা প্যাডেল চালিয়ে পাঁচ গজের মত গেছে, ঠিক তখন পেছন থেকে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল কে যেন, 'অ্যাই! দাঁড়াও!'

থেমে পড়ল কিশোর। ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল।

কফির দোকানের সেই লোকটা, কোট মুড়ি দিয়ে মুখ ঢেকে যে কফি খাচ্ছিল, হনহন করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'কাসলারের সঙ্গে তোমাদের কী কাজ?' লোকটা ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। টেনেটুনে সোয়া পাঁচ ফুট হবে সে লম্বায়। কাঠামোটা হালকা-পাতলা। কুতকুতে চোখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওদের দিকে।

'তা দিয়ে আপনার কী দরকার?' কণ্ঠে বিরক্তি ফুটিয়ে তুলল কিশোর।

'তোমরা তোমাদের কাজের কথা আমাকে বলতে পারো,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আমি তাকে চিনি।'

'চেনেন নাকি?' উজ্জ্বল হলো কিশোরের চেহারা। 'তার বাসা চেনেন? তা হলে আমাদের বাসাটা চিনিয়ে দেবেন? ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়া জরুরী।'

'সে কথাটাই তো জানতে চাইছি,' বলল লোকটা। 'কী কাজ?'

'সেটা তাঁকেই বলব,' একঘেয়ে সুরে বলল কিশোর।

'আপনার ইচ্ছে হলে বাসা চিনিয়ে দেবেন,' এবার মুখ খুলল মুসা। 'না হলে চলে যাই।'

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল লোকটা। তারপর বলল, 'এসো আমার

সঙ্গে,' ঘুরে দাঁড়াল সে, হাঁটতে শুরু করল।

'যাবে?' কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করল মুসা। 'লোকটার ভাবগতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'অচেনা কারও বাসা চিনিয়ে দেবার জন্যে এখানে চেনা লোক কোথায় পাবে তুমি?' বলল কিশোর।

'না, মানে, ঘটনা আবার নতুন কোনও দিকে মোড় নিলে?' বলল মুসা।

লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে চাইল।

'কী হলো, আসছ না কেন?' বলল সে। 'ভয় লাগছে?' বিশ্রী খনখনে গলায় হেসে উঠল।

হাসিটা ওদের গায়ে বিছার হুল হয়ে ফুটল। কথা না বলে প্যাডেল মারল তিন গোয়েন্দা। লোকটা আবার সচল হলো।

নানা গলিঘুঁচি পেরিয়ে একটা পুরানো বিশাল গাছের ধারে চলে এল ওদের নিয়ে।

গাছটার বিপরীত দিকে একটা একতলা, জীর্ণ চেহারার দালান। জানালা ভাঙা। আশপাশে কোনও বাড়িঘর নেই। কেমন থমথম করছে চারপাশ।

রহস্যময় লোকটা ফিসফিস করল, 'এটাই কাসলারের বাড়ি। তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি গিয়ে দেখি সে আছে কিনা।'

লোকটা হঠাৎ করেই যেন নেই হয়ে গেল আঁধারে। রীতিমত চমকে উঠল মুসা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের কোথাও, ভাবতে অবাক লাগে।

যেন কবরখানায় ঢুকে পড়েছে ওরা, এমন নিস্তব্ধ চারদিক।

আশ্চর্য! একটা ঝিঁঝি পর্যন্ত ডাকছে না।

লোকটা গেছে তো গেছেই, আর দেখা নেই।

ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠল ওরা।

কিশোর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে।

দরজায় কান পাতল।

কিছু শোনা যাচ্ছে না।

সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ঘটাং শব্দে খুলে গেল দরজা।

লোক নয়, বেরিয়ে এল চকচকে কালো একটা পিস্তল!

কিশোরের গলায় ঠেসে ধরা হলো ওটার নল।

খনখন করে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠ, 'ভিতরে ঢোকো! বিটলামি করবে না, তাইলে কিন্তু এক গুলিতে ফুটো করে দেব!'

ছয়

চমকে গেল কিশোর। এ ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম নয় ওর।

তবে কোনও চালাকি করতে চাইল না। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

এবার দরজাটা পুরোপুরি ফাঁক হয়ে গেল। কোট পরা সেই লোকটা! সে-ই স্বয়ং হেরোইন কাসলার।

পিস্তলটা মুসা আর রবিনের দিকে তাক করে কঠিন গলায় বলল, 'তোমরাও! ভিতরে এসো!'

ওরা টিভি আর সিনেমার পর্দায় বা পুলিশদের কাছেও বহুবার পিস্তল দেখেছে, কিন্তু সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা ওদের দিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল। লোকটার নির্দেশ পালন করল ওরা, ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিন। বিড়বিড় করল, 'ঘটনা তা হলে...'

'কী বলতে চাও ছোকরা!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা কুকুরের মত।

'না, কিছু না!'

'গুজগুজ করে কথা বলবে না তোমরা,' দরজা বন্ধ করল লোকটা, ঘুরল ওদের দিকে। 'যা জানতে চাইব, সোজাসুজি জবাব দেবে।'

'পিস্তলটা সরিয়ে রাখুন,' নরম স্বরে বলল কিশোর। 'আমরা আপনার কোনও ক্ষতি করতে আসিনি।'

'কাসলারের সঙ্গে তোমাদের কীসের দরকার?' অস্ত্র নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমরা ওঁকে সাবধান করে দিতে এসেছি,' মুসা জবাব দিল।

'ওঁর মস্ত বিপদ!'

'বিপদ! কীসের বিপদ?' গর্জে উঠল লোকটা। 'কাসলার কাউকে ভয় পায় না। তার আবার কীসের বিপদ! তোমরা কারা?'

'তার আগে বলুন আপনি কে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'যার খোঁজে এসেছ, তাকে দেখেও চিনতে পারছ না?' খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল লোকটা। মুখ মোড়ানো মাফলার সরিয়ে দিল মাথা থেকে। এবার লোকটার পুরো চেহারা দেখল ওরা।

ডান গালে মস্ত একটা কাটা দাগ।

'আপনিই তা হলে...' ইতস্তত করতে লাগল রবিন।

'হ্যাঁ, আমিই কাসলার। এবার বলে ফেলো, আমাকে খুঁজছ কেন?'

'আপনাকে মুরগি-ছিলা হেক্টর খুঁজছে,' সরাসরি বলল কিশোর। 'খুন করবে সে আপনাকে।'

'কী!' পলকে সাদা হয়ে গেল কাসলারের চেহারা। 'তোমরা ওর কথা জানলে কী করে?'

'যেভাবেই হোক জেনেছি,' কিশোর বলল। 'সে আপনাকে খুন করবে বলেছে। বলল, আপনি নাকি আজ সকালে তাকে গুলি করেছেন।'

'হ্যাঁ, করেছিই তো,' হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠল কাসলারের চেহারা। 'ও তো মরে গেছে। মরা মানুষ আবার বেঁচে ওঠে কীভাবে?'

'জানি না, তবে হেক্টর বেঁচে উঠেছে। এখন ছুটে আসছে আপনাকে মারার জন্যে।'

'বলে কী! ' দাঁত কিড়মিড় করল কাসলার। 'হারামজাদার এবার রক্ষা নেই! আধাআধি বখরার কথা ছিল সবরকম চাঁদা থেকে। কিন্তু আমাকে দেয়নি। ঠকিয়েছে। আজকে সুযোগ পেয়ে দিয়েছি গুলি করে; কিন্তু শালা আবার বেঁচে উঠেছে, মানে মরেনি? ঠিক আছে, এইবার ওকে একেবারে...'

'খুন-খারাবির মধ্যে যাবেন না,' বলল কিশোর। 'আপনি সন্ত্রাসী, তবু আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি, যাতে বেঘোরে প্রাণ না হারান।'

'চোপ!' চোখ রাঙাল কাসলার। 'বেশি বকবক করলে...'

'দেখুন, আপনি কিন্তু...' বলতে শুরু করেছে কিশোর।

কিন্তু গর্জন ছাড়ল কাসলার, 'আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ ছোকরারা! দাঁড়াও, এখনই ফুটো করে দেব তোমাদেরকে।'

'বেশি বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে পুলিশে দেব আমরা,' মনে মনে বলল মুসা। কিন্তু তা কীভাবে, ভেবে পেল না।

কাসলার সশব্দে পিস্তল কক্ করল, কিশোরের দিকে ঘোরাতে শুরু করেছে। ঠিক তখনই সোফা থেকে একটা কুশন তুলে লোকটার দিকে ছুঁড়ে মারল মুসা।

ওটা লাগল তার হাতে। কেঁপে উঠল পিস্তল।

বুম্ম্!

প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল পিস্তল। ভয়ানক আওয়াজে লাফিয়ে উঠল সবাই, এমনকী কাসলারও।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওরা ছাদের দিকে। ওখানে সদ্য একটা গর্ত তৈরি হয়েছে। প্লাস্টার খসে পড়ছে ঝুরঝুর করে।

কাসলার প্রথমে পিস্তলের দিকে চাইল, তারপর ছাদের দিকে।

ঠিক এমন সময় সামনের দরজায় কে যেন সজোরে লাথি মারল। ক্রুদ্ধ একটা গর্জন ভেসে এল, 'কাসলার!'

'এসে পড়েছে!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'নির্ঘাত হেক্টর!'

দরজায় আবার দড়াম. করে লাথি। থরথর করে কেঁপে উঠল কাঠের দুর্বল পাল্লা। 'দরজা খোল, শয়তান!'

আবার লাথি পড়ল। খিল ছুটে গেল। ভিতরে ঢুকল সেই জিন্দালাশ।

হেক্টর!

টকটকে লাল চোখ মেলে চাইল কাসলারের দিকে। দু'চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে ঘৃণা।

পিস্তল তাক করল কাসলার তার পুরানো শত্রুর দিকে। কুটিল হাসি ফুটল ঠোঁটে, 'এসে পড়েছ দোস্ত, এবার আর বাঁচবে না তুমি!'

কিশোর-রবিন-মুসা অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে থাকল। আহত হেক্টরের

দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, ঝাঁপিয়ে পড়ল কাসলারের উপর।

একটা সোফার উপর পড়ল দু'জনেই, পরমুহূর্তে দেখা গেল হেক্টর ঘাড় চেপে ধরেছে কাসলারের।

কাসলার এক হাতে মুখ খামচে ধরেছে হেক্টরের, আরেক হাতে ধরা পিস্তল।

হঠাৎ আবার 'বুমম'!

পিস্তলের গুলি এবার বারোটা বাজাল টেবিলের উপর রাখা টিভি সেটের।

ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ, ঘর ভরে গেছে ধোঁয়ায়।

'প্রতিশোধ!' গাঁকগাঁক করে চেঁচাল মুরগি-ছিলা।

'পালাও!' বন্ধুদের উদ্দেশে ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাও ঘর থেকে! দাঁড়াবে না! গুলি লাগতে পারে!'

ওরা তিনজন ক্রল করে বেরিয়ে এল। ঢুকল ছোট একটা রান্নাঘরে। আবার গুলির শব্দ।

দ্রুত এদিক-ওদিক চাইল কিশোর। রান্নাঘরের ওপাশে একটা দরজা। হয়তো খিড়কি দরজা। ওদিকে এগোল তিনজন।

খিল খুলল মুসা। ঠিক, দরজার পরেই একটা গলি।

'চল পালাই!' রুদ্ধশ্বাসে বলল কিশোর। 'জলদি!'

রবিন ছুটল আগে। তারপর বেরুল মুসা।

কিশোর বেরুতে যাবে, এমন সময় আবার 'বুমম'!

তারপর হঠাৎ নীরব হয়ে গেল চারপাশ। পাশের ঘর থেকে আর শোনা গেল না ধস্তাধস্তির শব্দ।

কৌতূহল হলো কিশোরের। মরল নাকি কাসলার? নাকি 'আবার' মারা পড়ল মুরগি-ছিলা হেক্টর?

উঁকি দিল ও। সাথে সাথে আঁতকে উঠল।

রান্নাঘরের দরজার সামনে টলতে টলতে এসে দাঁড়িয়েছে মুরগি-ছিলা, হাতে উদ্যত পিস্তল।

ওটা কিশোরের দিকে তাক করে হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'ছাড়ব না!'

সাত

বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে রইল কিশোর।

নড়তে ভুলে গেছে।

আবার গর্জন ছাড়ল সন্ত্রাসী, 'কাউকে ছাড়ব না!'

পিস্তলের নলটা যেন সম্মোহন করেছে কিশোরকে, এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওটার দিকে। দেখছে ট্রিগারে চেপে আছে হেক্টরের আঙুল।

ঠিক তখনই দশ ইঞ্চি একটা ইঁট ছুটে এল বাইরে থেকে, সরাসরি আঘাত করল ওটা মুরগি-ছিলার হাতে।

'বাপরে!' আর্তনাদ করে উঠল হেক্টর। ছিটকে পড়েছে পিস্তল, হাত চেপে ধরে বসে পড়ল সে।

আস্তিনে টান পড়ল কিশোরের, ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে চাইল।

মুসা।

'চলো, শিগগিরি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। ও-ই ইঁট ছুঁড়ে মেরেছে। চলে গিয়েছিল, কিশোর আসছে না দেখে আবার ফিরে এসেছে। এসে দেখে হেক্টর গুলি করতে যাচ্ছে প্রিয় বন্ধুকে। হাতের কাছে একটা ইঁট পেয়ে ওটাকে কাজে লাগিয়েছে।

টার্গেট অব্যর্থ।

মুসার সাথে ছুটল কিশোর। সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল একটা কাঠের বেড়া। ওপাশে উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। কিশোরকে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

বেড়াটা ফুট চারেক উঁচু। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওটার উপর উঠছে দুই বন্ধু।

ওদের পিছনে চেয়ে আঁতকে উঠল রবিন, 'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল। 'আসছে মুরগি-ছিলা!'

লাফ দিল ওরা। পরক্ষণে ব্যথায় নীল হয়ে উঠল কিশোরের

চেহারা। প্রচণ্ড বাড়ি খেয়েছে হাঁটুতে, যেন পেরেক ঢুকে গেছে। হাঁটু ধরে রাস্তায় পড়ে রইল ও।

'ওঠো!' রবিন আর মুসা দু'পাশ দিয়ে ধরল ওর দু'হাত।

'পারছি না!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'আমার হাঁটু গেছে!'

মুখ শুকিয়ে গেল ওদের। মুসা চট করে একবার চাইল বেড়ার ওপাশে।

দু'হাত সামনে বাড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে হেক্টর।

অবিকল একটা জিন্দালাশ!

'তোলো ওকে!' কিশোরের একটা হাত নিজের কাঁধে তুলে নিল মুসা। ওর দেখাদেখি অন্য হাতটা তুলে নিল রবিন। প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে চলল ওরা কিশোরকে। কিশোর ব্যথায় কাতরে উঠল।

'ওদিকে!' ফিসফিস করে রবিনকে বলল মুসা। 'ডানে!'

বেড়া ভাঙার শব্দ হলো। তবে পিছন ফিরে দেখার সাহস হলো না কারও। জানে মূর্তিমান যমদূত আসছে ওদের জান কবচ করতে।

চলার গতি আরও দ্রুত হলো।

ডান দিকে সরু একটা প্যাসেজ। দু'পাশে টিনশেড আর গ্যারেজ। ওরা ঢুকে পড়ল। কয়েক পা যেতেই প্যাসেজ শেষ হয়ে গেল। আবার বড় রাস্তায় উঠে এসেছে ওরা। পিছন থেকে পায়ের আওয়াজ আসছে।

আসছে মুরগি-ছিলা!

উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক চাইল তিন গোয়েন্দা। দু'একটা প্রাইভেট কার মাঝে-মধ্যে পানি ছিটিয়ে হুশ করে চলে যাচ্ছে, এ ছাড়া প্রায় জনশূন্য রাস্তা। ওদিকে হেক্টরের পায়ের আওয়াজ ক্রমে এগিয়ে আসছে।

ভীষণ অসহায় বোধ করল তিন বন্ধু। চিৎকার দিলেও কেউ শুনবে বলে মনে হলো না।

একে তো গভীর রাত, তার উপর টিপটিপ বৃষ্টি। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে।

হঠাৎ আলোর বিন্দুটা চোখে পড়ল ওদের। এদিকেই আসছে।

একটা ট্যাক্সি। রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

হাত নেড়ে থামতে বলছে ওটাকে।

কিন্তু ওটার থামার কোনও লক্ষণ নেই। উপায় নেই দেখে মারাত্মক এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা। চট করে শুয়ে পড়ল রাস্তার ঠিক মাঝখানে।

কিশোর আঁতকে উঠল। পাগল হয়ে গেল নাকি মুসা? এখনই তো গাড়িটা ওকে চাপা দিয়ে চলে যাবে।

না, চাপা পড়ল না মুসা।

ওর পাঁচ হাত দূরে কড়া ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি।

তরুণ চালক চরম বিরক্তি নিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল, 'তোমরা পাগল, না নেশাখোর? এখনই তো অ্যাক্সিডেন্ট হতো।'

আট

'কী চাও তোমরা?' জিজ্ঞেস করল চালক। ভুরু কুঁচকে ওদের তিনজনকে দেখছে। ট্যাক্সির হেড লাইটের আলোয় তিন কিশোরের হতচ্ছাড়া চেহারা দেখে গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে মনে। 'ব্যাপার কী?'

'দেখুন!' বলল কিশোর। ঝট করে পিছন দিকে চোখ বুলিয়ে নিল মুরগি-ছিলা হেক্টর আসছে কি না। 'আমাদেরকে দয়া করে কিলনার বিচে পৌঁছে দেবেন?'

মাথা নাড়ল যুবক চালক। 'সম্ভব না। গাড়িতে তেল নেই।'

মিথ্যে বলল সে। তেল নেই কথাটা সত্যি নয়, সত্যি হলো এমন দুর্যোগে জনহীন পথে কাকভেজা তিন কিশোরকে দেখে সন্দেহ হয়েছে তার। ধরেই নিয়েছে, এরা চোর-ছ্যাঁচোড় অথবা ছিনতাইকারী হবে, তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে।

নিশ্চয়ই তাড়া করা হচ্ছে ওদেরকে। নইলে সবাই পিছনে তাকাচ্ছে কেন বারবার?

'তেল নেই!' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা।

'না,' মাথা নাড়ল যুবক। 'অল্প আছে, কোনও রকমে গ্যারেজ পর্যন্ত যেতে পারব।'

'কোথায় আপনার গ্যারেজ?' কিশোর বলল।

সামনে দেখাল সে আঙুল তুলে। জায়গাটা কাছেই, তবে বৃষ্টির জন্য ঝাপসা লাগছে।

বৃষ্টির বেগ এখন কমেছে অনেকটা, বাতাসেও আগের সেই তেজ নেই। মনে হয় থেমে আসছে ঝড়বৃষ্টি।

'ওখানে তেল আছে না?' কিশোর বলল। 'আমি তেল কেনার টাকা দেব। ভাড়াও দেব যা চান। দয়া করে কিলনার পর্যন্ত পৌঁছে দিন।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'শুধু তেলে কাজ হবে না, গাড়ির ইঞ্জিনেও গোলমাল আছে। পানি ঢুকেছে।'

রেগে উঠল মুসা। 'অ্যাই মিস্টার, ইঞ্জিনে গণ্ডগোল থাকলে এতক্ষণ চালালেন কী করে?'

ফাঁদে পড়েছে বুঝতে পেরে অন্য ফন্দি আঁটল চালক। বলল, 'বিশ্বাস হয় না? দেখতে চাও? এই দেখো,' বলে ওদের সবার অলক্ষে ক্লাচ চেপে গিয়ার দিল সে। চাপ দিল একসেলারেটারে।

তারপর ওরা ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝে উঠবার আগেই ক্লাচ ছেড়ে দিল, লাফ দিল গাড়ি। ওদের হতভম্ব দৃষ্টির সামনে দিয়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেল, দেখতে দেখতে চলে গেল নাগালের বাইরে।

লোকটার চালাকি ধরতে পেরে এ-ওর মুখের দিকে চাইল তিন গোয়েন্দা।

'যাহ!' বলে উঠল রবিন।

'লোকটা বেশি সেয়ানা,' তিক্ত স্বরে বলল মুসা।

গাড়ির টেইল লাইটদুটো ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল। কী করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কিশোর।

সাথে সাইকেল থাকলে কোনও চিন্তা ছিল না। কিন্তু ওগুলো ফেলে আসতে হয়েছে কাসলারের বাড়ির সামনে।

এখন ওদিকে যাওয়ার উপায় নেই।

গেলেই বিপদ।

অন্ধকারে যে-কোনও সময় ঘাড়ের উপর চড়াও হবে মুরগি-ছিলা হেক্টর। আশপাশেই কোথাও আছে সে।

কোথায়?

কতদূরে?

একটা ছপাৎ ছপাৎ শব্দ শুনছে ওরা সবাই। পানিতে পা টেনে হাঁটছে কেউ। এদিকেই আসছে। পিছন দিক থেকে।

অসহায় চোখে পথের দু'দিকে চোখ বোলাল কিশোর।

নিচু এলাকা এটা। ঝড়-বৃষ্টির কারণে রাস্তার দু'দিকে জলাভূমি তৈরি হয়েছে। থই থই করছে পানিতে। কোথাও যে আত্মগোপন করবে সে পথ নেই।

শব্দটা এগিয়ে আসছে।

ছপ্ছপ্!

ছপ্ছপ্!

গাড়ি যেদিকে গেছে, সেদিকে চাইল কিশোর। বেশ কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে ওদিকে। বেশি দূরে নয় জায়গাটা। ওদিকেই যাবে ঠিক করল। এ ছাড়া উপায় নেই।

'শয়তানের দল!' পিছন থেকে গর্জে উঠল সন্ত্রাসী। 'আজ আর নিস্তার নেই তোদের!'

আর কিছু শুনবার দরকার মনে করল না কিশোর। বন্ধুদের উদ্দেশে 'দৌড় দাও!' বলে হাঁটুর ব্যথা ভুলে ছুটতে শুরু করল।

মুসা ও রবিন ওর পাশে ছুটে চলল। একই সঙ্গে পিছনের ছপাৎ ছপাৎ শব্দটা দ্রুততর হলো।

হেক্টরও দৌড় শুরু করেছে। তবে ওদের তুলনায় তার গতি ধীর। দু'মিনিটে জায়গামত পৌঁছে গেল কিশোর-মুসা-রবিন।

বেশ কিছু ইঁটের বাড়ি আছে এখানে। দু'তিনটে ওয়্যারহাউস। আর আছে দুটো গ্যারেজ। বেশ বড়। দুটোর ভিতরে লাইন দিয়ে রাখা ট্যাক্সিক্যাব। একটা করে বালব জ্বলছে ভিতরে। মানুষের সাড়াশব্দ নেই।

কী করবে ভাবছে কিশোর, এমন সময় জিনিসটার উপর চোখ

পড়ল। একটা ছোট পিক আপ ভ্যান। দুই গ্যারেজের মাঝে সরু এক গলিতে রাস্তার দিকে মুখ করে রাখা। ভিতরে কেউ নেই। দরজা বন্ধ, তবে দেখে মনে হলো তালা মারা হয়নি।

ইগনিশন স্লটে চাবিটাও আছে!

সন্দেহের চোখে এদিক-ওদিক চাইল কিশোর। মনে হচ্ছে ড্রাইভার হয়তো ধারেকাছেই আছে।

হয়তো তলপেটের চাপ খালাস করছে কোথাও।

কান খাড়া করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কিশোর। নাহ, কোনও শব্দ নেই। গাড়ির পঁচিশ-ত্রিশ গজ পিছনে একটা টিনশেড বাড়ি, ওটার ভিতরে আলো জ্বলছে। সামনের দরজা সামান্য খোলা।

কিশোরের মনের ভাবনা পড়ে ফেলল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'ড্রাইভার লোকটা মনে হয় ওই বাড়িতে আছে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' মন্তব্য করল রবিন।

'উঠে পড়ো গাড়িতে,' কিশোর বলল। 'এটা নিয়েই পালাই।'

'গাড়ি চুরি করবে?' রবিন বলল আমতা আমতা করে।

'তো কী!' বলল কিশোর। 'অস্ত্র নিয়ে তাড়া করছে খুনি, তার হাত থেকে বাঁচার আর কোনও উপায় আছে? উঠে পড়ো!'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল কিশোর। রবিন বসল মাঝখানে, মুসা অন্য মাথায়।

'দরজা আস্তে বন্ধ কোরো,' কিশোর বলল। 'বেশি শব্দ কোরো না।' মুরগি-ছিলা হেক্টর আসছে কি না দেখবার জন্য পিছনে চাইল। পরক্ষণে সশব্দে আঁতকে উঠল। 'আসছে!'

ধড়মড় করে ঘুরে চাইল রবিন ও মুসা।

সত্যিই আসছে হেক্টর। এক পা টেনে টেনে হাঁটছে। যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে।

চাবি ঘোরাল কিশোর। কুঁই-কুঁই শব্দে সাড়া দিল স্টার্টার, কিন্তু কাজ হলো না। চাবি ছেড়ে দিতেই আওয়াজ থেমে গেল। 'কী হলো!' বলল মুসা। 'স্টার্ট নিচ্ছে না?'

'না!'

আরও কয়েকবার নিষ্ফল গুঞ্জন তুলল ইঞ্জিন, হতাশ হয়ে হাল প্রায় ছেড়েই দিতে দিচ্ছিল কিশোর, এমন সময় স্টার্ট নিল পিক আপ।

পিছনে দড়াম করে দরজা খোলার শব্দ উঠল, তার সাথে একটা চিৎকার।

পাত্তা দিল না কিশোর। গিয়ার দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। গলি ছেড়ে রাস্তায় এসে ঘুরল দ্রুত।

হুইল ঘোরাবার ফাঁকে পলকের জন্য একবার পিছন দিক দেখল। মূর্তিমান আতঙ্কের মত দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে মুরগি-ছিলা হেক্টর।

এক হাতে পিস্তল!

ওটা সন্ত্রাসী কাসলারের, কিশোর জানে হেক্টর কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে।

এর মানে কী? ভাবল। কাসলারকে মেরে ফেলেছে লোকটা?

গ্যাস পেডাল চেপে ধরল কিশোর। ঝাঁকি খেয়ে ছুটল পিক আপ। কিন্তু গতি তেমন উঠছে না দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

যে গতিতে চলছে, তাতে দৌড়েই ধরে ফেলবে মুরগি-ছিলা।

ওর সন্দেহ সত্যি হলো। ক্রমে এগিয়ে আসছে লোকটা, দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছে টেইল বোর্ড ধরার জন্য।

পেডাল পুরো চেপে ধরেছে কিশোর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। গতি একটুও বাড়ছে না। এমন ভাবে চলছে যে একটা বাচ্চা ছেলেও দৌড়ে ধরে ফেলবে।

জিন্দালাশটার হাত থেকে কীভাবে বাঁচা যায়, ভাবতে চাইল কিশোর। বুদ্ধিটা পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গতি কমিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে আসতে সুযোগ দিল লোকটাকে। তাই দেখে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'কী করছ!'

'ধরে ফেলল তো!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রবিন।

নিচু স্বরে বলল কিশোর, 'মজা দেখাচ্ছি ওকে।'

সুযোগ পেয়ে অনেক কাছে চলে এসেছে মুরগি-ছিলা হেক্টর। দু'হাত টেইল বোর্ড ধরে ধরে অবস্থা। যে-কোনও মুহূর্তে ধরে ফেলবে।

এমন সময় কড়া ব্রেক কষল কিশোর। গাড়ি এমন আচরণ করবে জানা ছিল না হেক্টরের। ওটা হঠাৎ থেমে পড়তেই ভারসাম্য রাখতে পারল না, ছুটে এসে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল টেইল বোর্ডের উপর।

বোর্ড ধরে নিজেকে সামলাতে চাইল, কিন্তু ওটা ভেজা থাকায় হাত পিছলে গেল শেষ মুহূর্তে।

নাকেমুখে দড়াম করে প্রচণ্ড এক বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। আছড়ে পড়ল মাটিতে।

বিকট গলায় একবার চেঁচিয়ে উঠল।

তারপর স্থির হয়ে গেল।

জ্ঞান হারিয়েছে?

নয়

গিয়ার দিয়ে আবার গ্যাস পেডাল চেপে ধরল কিশোর। লাফাতে লাফাতে ছুটল পিক আপ। গাড়ির সঙ্গে ওরা তিনজন লাফাচ্ছে পুতুলের মত।

'আরেকটু জোরে চালাতে পারো না?' মুসা বলল। 'হেক্টর তো উঠে বসেছে।'

'চেষ্টা করছি, কিন্তু কাজ হচ্ছে না,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'গিয়ার নিচ্ছে না, শুধু ফার্স্ট গিয়ারে চলছে।'

গিয়ার স্টিক ধরে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে দিল। বিকট আওয়াজ হলো তাতে, আর কোনও কাজ হলো না।

বিরক্তি প্রকাশ করল মুসা। 'শেষ পর্যন্ত জুটল পচা গাড়ি, বাতের রোগীর মত কেবল গোঙায়, নড়ে না।'

'আর কী আশা করো?' কিশোর বলল। 'রেসিং কার? আমরা চাইলে তুফান মেলের মত ছুটবে?'

'সেরকম না হোক, অন্তত বাংলাদেশের মুড়ির টিন বাসগুলোর মত চললেও হতো!' মুসা বলল। 'হাঁটলেও তো এর চেয়ে জোরে যেতে

পারতাম আমরা।'

আরেকবার গিয়ার বদল করার চেষ্টা করল কিশোর। তারপর হাল ছেড়ে দিল, 'যা! এত অন্ধকার কেন সামনে? কিছুই তো দেখছি না!'

'দেখবে কী করে?' মুসা বলল। 'হেডলাইট তো জ্বালোইনি!'

'কী?' বুঝতে পেরেছে কিশোর। একদিকের চাকা গর্তে পড়ল। ধুম করে আছাড় খেল পিক আপ, প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল ওটা। তাড়াতাড়ি হেড লাইটের সুইচ অন করে দিল কিশোর। একজোড়া আলোর স্তম্ভ ফকফকা করে দিল সামনের দিকটা।

'এখনও পিছু লেগে আছে?' আপনমনে বলল মুসা। ভয়ে ভয়ে রিয়ার ভিউ মিররের ভিতর দিয়ে পিছনে চাইল।

কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হেলান দিল। মনে হয় এ যাত্রা রেহাই পাওয়া গেছে।

'নেই,' বন্ধুদের উদ্দেশে বলল। 'যাক, ফাঁড়া কেটেছে।'

'হ্যাঁ, বাঁচলাম,' বলল রবিন। ঘুরে কিশোরের দিকে চাইল।

কিশোর কিছু বলছে না দেখে মুসা বলল, 'গাড়ি চুরির অপরাধে যদি পুলিশ ধরে?'

'আমরা ইচ্ছে করে চুরি করিনি,' কিশোর বলল। 'বাধ্য হয়ে প্রাণের দায়ে করেছি।'

'কিন্তু পুলিশ যদি বিশ্বাস না করে?'

'যদি সেরকম কিছু ঘটে, সে তখন দেখা যাবে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল।

খটর মটর আওয়াজ তুলে হেলে দুলে ছুটছে লক্কড় মার্কা পিক আপ ভ্যান। ঘোড়া নাক দিয়ে যেমন আওয়াজ করে, তেমনি আওয়াজ করছে থেকে থেকে।

'এভাবে সারারাত একটানা চলতে পারলে ভালই হত,' রবিন বলে উঠল। 'মুরগি-ছিলা নাগাল পেত না আমাদের।'

'কিন্তু সে উপায় নেই,' মুসা বলল। 'এখন আমাদের প্রধান কাজ শ্যারনকে সতর্ক করা।'

আপন মনে মাথা দোলাল কিশোর। রবিন ও মুসাকে বলা হয়নি

চাচার বাড়িতে প্রায় একাই আছে শ্যারন। ওর দাদীও আছেন অবশ্য, কিন্তু তিনি বুড়ো মানুষ। তার উপর চোখে অল্প দেখেন। শ্যারনের চাচা-চাচী তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একদিনের জন্য টেক্সাসে গেছেন।

বাড়ি খালি রেখে যেতে চাননি চাচী, কাজেই শ্যারনকে বলে গেছেন রাতটা ওখানে থাকতে।

এ অবস্থায় মুরগি-ছিলা হেক্টর যদি ওই বাড়িতে ঢোকে, ম্যাজিস্ট্রেটকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যারনের উপর হামলা করতে পারে।

বেচারী জানে না কী ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে ওর মাথার উপর।

'পেছনে চেয়ে দেখো লোকটা আসছে কি না,' বলল কিশোর।

মুসা ও রবিন একযোগে ঘুরে চাইল।

নাহ্, দেখা নেই লোকটার।

বৃষ্টির বেগ একটু বেড়েছে যেন।

একদম নির্জন এলাকা। থই-থই পানির মধ্য দিয়ে যাওয়া সরু খোয়া বিছানো পথ, সে পথে এগিয়ে চলেছে ওরা।

রাস্তার দিকে না চাইলে মনে হবে ওরা রয়েছে নদীতে। কোনও ইঞ্জিনচালিত বোটে।

'নেই লোকটা,' চূড়ান্ত মতামত জানাল রবিন। 'অনেক পেছনে পড়ে গেছে।'

'অথবা...' কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল মুসা।

ঘুরে চাইল কিশোর। 'অথবা কী?'

'হয়তো পানির মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি কিলনার বিচের দিকে যাচ্ছে।'

'কোনাকুনি যেতে পারে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'ঠিক বলেছ।'

'ওদিক দিয়ে গেলে পথ অনেক কম। আমাদের দ্রুত যাওয়া উচিত! হেঁটে গেলেও এতক্ষণে হয়তো কিলনার বিচে পৌঁছে যেতাম।'

'অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'পথ আছে বলে

হেক্টর যেতে পারবে, এমন কোনও কথা নেই। জলাভূমির পানির গভীরতা কম নয়। প্রায় বুক সমান। যেতে হলে সাঁতরে যেতে হবে। আমার মনে হয় না গুলি খাওয়ার পর হেক্টরের সাঁতরাবার মত অবস্থা আছে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল রবিন। 'আমি দেখেছি ডান হাত ঠিকমত নাড়তে পারছিল না।'

'আমিও দেখেছি,' মুসা বলল।

'আমি ভাবছি অন্য কথা,' কিশোর নড়েচড়ে বসল।

'কী?' রবিন প্রশ্ন করল।

'ভাবছি, কাসলারই যদি শত্রু হবে, তা হলে শুধু ওর ওপর প্রতিশোধ নিলেই তো হয়। কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, এদের জড়াবার দরকার কী?' সামনে বাঁক দেখে গাড়ি ঘোরাল কিশোর।

তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল: 'আসলে মনে হয় জেলে গেছে বলে বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে লোকটা। নিজের বেআইনী কাজকে বেআইনী মনে হয় না তার। ভাবে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে জেলে পাঠিয়ে অন্যায় করেছে।

'কমিশনারের ব্যাপারে সেরকমই কিছু ভেবে রেখেছে হেক্টর। তাকে আশ্রয় দেয়নি বলে কমিশনারও তার শত্রু হয়ে গেছে। কাসলার, ম্যাজিস্ট্রেট আর কমিশনার, সবাইকে একই দৃষ্টিতে দেখছে।'

ভুরু কুঁচকে সামনে চেয়ে আছে কিশোর। একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'তার চোখ ঘৃণায় কেমন চকচক করছিল দেখেছ? মনে হয় মানুষটা সুস্থ নয়, উন্মাদ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আসলে কি এখনও মানুষ আছে ও?' রবিন বলে উঠল। 'যে মানুষটা সকালে সবার চোখের সামনে খুন হলো, যার লাশ কাটাছেঁড়ার জন্যে মর্গে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রাখা হলো, সে কী করে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল? এ কেমন করে সম্ভব?'

'আমিও তাই ভাবছি,' বলল কিশোর। 'সত্যি এমন আজব ঘটনা যে ঘটে, আজই প্রথম জানলাম।'

'শুধু তা-ই নয়,' মুসা বলল। 'হাড়ে হাড়ে টেরও পাচ্ছি।'

হঠাৎ কাশির মত আওয়াজ করতে লাগল গাড়ির ইঞ্জিন। ঝাঁকির পর ঝাঁকি খেতে লাগল ঝড়ে পড়া নৌকার মত।

'কী হলো?' বলল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। ওর কোনও ধারণা নেই হঠাৎ কেন এমন অদ্ভুত আচরণ শুরু করেছে পিক আপ।

খানিক দূর লাফিয়ে চলার পর থেমে দাঁড়াল গাড়ি। ইঞ্জিন হুডের ফাঁক দিয়ে গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তারপরই বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার মত বিকট শব্দে ব্যাকফায়ার করল ইঞ্জিন। এবং বন্ধ হয়ে গেল।

কিশোর নীরবতা ভাঙল। দরজা খুলে নেমে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'আর উপায় নেই। গাড়ির আশা বাদ দিয়ে এখন বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে।'

পিছনের অন্ধকারে হয়তো কোথাও আছে মুরগি-ছিলা হেক্টর। ধেয়ে এসে ওদের ঘাড় চেপে ধরবে।

সাহস করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল দুই গোয়েন্দা। পিছনে চেয়ে রইল।

বৃষ্টির টিপটিপ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে এক-আধটা শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে। পানিতে ব্যাঙ ডাকছে মহানন্দে।

এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'চল, তাড়াতাড়ি পৌছতে হবে।'

পাশে রওনা হয়ে গেল রবিন ও মুসা।

গুঁড়ো, ভেজা সুরকি মশমশ করছে ওদের পায়ের চাপে।

দশ

'তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত,' একটু পর কিশোর বলল। 'এদিকে মনে হয় আসেনি হেক্টর। কোনাকুনিই গেছে।'

'অথবা হয়তো এখনও পথেই পড়ে আছে,' মুসা বলল। 'জ্ঞান

ফেরেনি।'

'আমার তা মনে হয় না,' কিশোরের কণ্ঠে সন্দেহ ফুটল। 'জলদি পা চালাও।'

মিনিট পনেরো জোর পায়ে হেঁটে সুরকির রাস্তা পেরিয়ে পাকা সড়কে উঠল ওরা। ম্যাজিস্ট্রেট রবের বাড়ির কাছে পৌছতে আরও দশ মিনিট লাগল।

মূল রাস্তা থেকে ঢালাই করা প্রাইভেট রাস্তা গেছে বাড়ির গেট পর্যন্ত। সবুজ রঙের কাঠের গেট। কাঁটাতারের বাউণ্ডারি।

ভিতরে প্রচুর ফুল গাছ। কোথাও কোথাও বেশ ঘন, ঠিকমত আলো চলে না। গা ছমছম করে।

রাস্তার আলো বা পোর্চের আলো, কোনটা পর্যাপ্ত মনে হলো না। দূর থেকে প্রতিটা ঝোপের উপর সতর্ক নজর বোলাল তিন গোয়েন্দা।

কেউ বা কিছু যদি লুকিয়ে থাকে, দেখতে পাবে না ওরা।

আছে কেউ লুকিয়ে? ভাবল কিশোর।

লক্ষ রাখছে ওদের গতিবিধির উপর?

গা ছমছম করে উঠল ওর।

বাড়িটার উপর চোখ বোলাল ওরা। চমৎকার দেখতে ওটা। ঠিক একটা ছবির মত। নীচের পোর্চে আলো জ্বলছে, সযত্নে লালিত বাগানে তার আলো পড়ছে। বৃষ্টিস্নাত গাছের প্রতিটা পাতা চিকচিক করছে।

পুরু কার্পেটের মত বাগানের ঘাস থেকেও আলো ঠিকরাচ্ছে।

কান পেতে ঝিঁঝি পোকার তান ও ব্যাঙের কোরাস শুনতে পেল ওরা। আসলে ওসব নয়, অন্য কোনও ধরনের শব্দ ওঠে কি না, তাই শোনার অপেক্ষায় আছে ওরা তিন বন্ধু।

দোতলার সামনের ঘরে আলো জ্বলছে। জানালার পর্দা সরানো। সেদিকে চেয়ে থাকল কিশোর। হয়তো শ্যারনকে জানালায় দেখা যাবে, সেই আশায়। ভিতর থেকে উচ্চগ্রামে ইংরেজি গান ভেসে আসছে। তার মানে নিশ্চয় ভিডিওতে ছবি দেখছে শ্যারন।

'মৌজে আছে,' মুসা বলল।

'তা-ই তো দেখছি,' চাপা গলায় বলল কিশোর। 'হেক্টরের আগে

এখানে পৌচেছি আমরা।'

'কী করে বুঝলে?' প্রশ্ন করল রবিন।

'সোজা। সে যদি আগে আসত, কিছু না কিছু আলামত চোখে পড়ত।'

'কিন্তু যদি ঝোপের আড়ালে...' কথাটা শেষ করল না রবিন।

মুসাকে বলল কিশোর, 'তুমি গিয়ে শ্যারনকে খবর দাও। আমি আর রবিন এখান থেকে চারদিকে নজর রাখি।'

গেট থেকে বাড়িটার পোর্চ পর্যন্ত দূরত্বটুকু মনে মনে মেপে নিল মুসা। ঢোক গিলল নিঃশব্দে। ভয়ঙ্কর কোনও ভূত থাকতে পারে চারপাশে!

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' নিজেকে সাহস দিল মুসা। পরক্ষণে বলল, 'তুমি যাও না, কিশোর! চট্ করে গিয়ে শ্যারনকে বলতে পারো, যাতে চাচাকে খবর জানায়।'

'চাচাকে?' ঘুরে চাইল কিশোর। 'কিন্তু উনি তো এখানে নেই। আজ সকালে টেক্সাসে গেছেন একদিনের জন্যে। কাল রাতে ফিরে আসার কথা।'

রবিন বলল, 'তা হলে আর এত কষ্ট করে এখানে আসার কী দরকার ছিল? ম্যাজিস্ট্রেট আঙ্কেলকে না পেলে তো মুরগি-ছিলা এমনিতেই ফিরবে!'

'তা নাও হতে পারে,' বলল কিশোর। 'বরং হতাশ হয়ে হাতের কাছে যাকে পাবে, তাকেই...'

'হ্যাঁ,' বলল মুসা। 'ঠিক বলেছ। আর কে আছে বাড়িতে?'

'শ্যারনের দাদী আর ও নিজে।'

'তা হলে ওদেরকে নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়াই ভাল, কী বলো?'

'হ্যাঁ, তা-ই আসলে,' বলল রবিন।

গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। বুক ঢিবঢিব করছে।

গেট খুলে ভিতরে পা রাখল। ঘটল না কিছু। এরপর এক দৌড়ে পোর্চে চলে এল, প্রধান দরজার পাশে পৌঁছে কলিং বেল টিপল।

ভিতরে বেল বাজল কি না গানের কারণে বোঝা গেল না। কেউ সাড়াও দিল না।

আরও দু'বার বেল বাজাল কিশোর। সাড়া না পেয়ে দরজার কাছ থেকে সরে কাছের জানালা দিয়ে ভিতরে চোখ বোলাল।

পর্দার ফাঁক দিয়ে ড্রইংরুমের প্রায় পুরোটাই দেখা যায়। টিভি চলছে দেখল কিশোর, অথচ কোনও দর্শক নেই। সোফা সব খালি। কার্পেটও ফাঁকা। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল কিশোরের।

পৌঁছতে বেশি দেরি করে ফেলেনি তো ওরা?

আবারও দরজায় ফিরে এসে কলিং বেল চাপল কয়েকবার। মনে মনে আট পর্যন্ত গুনল, তবু সাড়া নেই।

বিরক্ত হয়ে জানালায় দমাদম কয়েকটা কিল মারল, চিৎকার করে ডাকল, 'শ্যারন, দরজা খোলো!'

সাড়া নেই।

প্রকাণ্ড ড্রইং রুমের ও-মাথায় সরু একটা প্যাসেজ, তার ওপাশে কিচেন। ওখানে জ্বলছে আলো।

চেয়ে ছিল কিশোর, হঠাৎ কিচেনের দেয়ালে একটা ছায়া নড়তে দেখে জমে গেল। একটু পর দেখতে পেল একটা হাত এবং সাদা ও লাল স্ট্রাইপের কামিজ। নিঃশ্বাস আটকে রাখল কিশোর।

কে ওটা?

শ্যারনই তো?

হ্যাঁ, সে-ই।

কাঁধ দিয়ে কানের সঙ্গে মোবাইল ফোন চেপে কথা বলছে কারও সঙ্গে। এক হাতে চিপসের খোলা প্যাকেট, কথার ফাঁকে ওটা থেকে চিপস তুলে মুখে চালান করছে। প্যাসেজে হাঁটাহাঁটি করছে।

হাসি হাসি, নিরুদ্বিগ্ন চেহারা।

দ্রুত জানালায় টোকা দিল কিশোর। গলা উঁচিয়ে ডাকল শ্যারনকে।

'আস্তে ডাকো!' একদম ওর কানের কাছে কেউ বলে উঠল।

সশব্দে আঁতকে উঠল কিশোর। চেয়ে দেখল ওটা মুসা।

'আস্তে!' আবার বলল মুসা। 'আশপাশের সবাই শুনবে।'

'একদিকে জোর ভলিউম দিয়ে টিভি চালিয়ে রেখেছে, অন্যদিকে টেলিফোনে কার সঙ্গে আলাপ জুড়েছে,' বলল কিশোর। 'এত ডাকছি, কলিং বেলের রিং, কিছুই শুনছে না।'

দরজার ইয়েল লকের হ্যাণ্ডেল ধরে ঘোরাতে চেষ্টা করল মুসা—ঘুরল না। 'এসো, কোনও জানালার পাল্লা খোলা যায় কি না চেষ্টা করে দেখি,' প্রস্তাব দিল।

তিন বন্ধু মিলে সামনের-পিছনের প্রতিটা জানালার পাল্লা টেনে দেখল—সব বন্ধ।

হঠাৎ দোতলার এক জানালার উপর চোখ পড়ল রবিনের। 'ওই দেখো,' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল। 'ওটা খোলা!'

ঠিকই বলেছে রবিন, একটা জানালা সত্যি খোলা। সম্ভবত ওটা বাথরুমের।

'ওটা দিয়ে ঢোকা গেলে কাজ হয়,' বলল মুসা।

'কিন্তু অত উঁচুতে উঠব কি করে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'তুমি আমার কাঁধে ওঠো, কিশোর,' বলল মুসা। 'তারপর তোমাকে নিয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়াব আমি। তুমি সানশেড হয়ে ঢুকতে পারবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ঠিক আছে, বসে পড়ো।'

এক হাঁটু গেড়ে বসল মুসা। কিশোর ওর হাঁটুতে এক পা রেখে অন্য পা কাঁধে তুলে দিল। 'ব্যথা লাগলে বোলো।'

'ওঠো তুমি,' দেয়াল ধরে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে মুসা। কাঁধে ব্যথা লাগছে বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রেখেছে।

কষ্টেসৃষ্টে ভারসাম্য রক্ষা করল কিশোর। দু'হাত বাড়িয়ে মাথার উপরের সানশেড ধরে ঝুলে পড়ল, দুই বাহুর টানে নিজেকে তুলে ফেলল সানশেডের উপর। সামান্য ডানে রয়েছে খোলা জানালাটা। কিন্তু নাগাল পেল না কিশোর। ওটা ধরতে হলে আরও উঁচু হতে হবে।

সমস্যাটা বুঝতে পেরে মুসা বলল, 'তুমি ওখানে থাকো, আমি আসছি। আমি তোমাকে তুলে ধরলে কাজটা সহজ হবে।'

মুসাকে সাহায্য করতে বসল রবিন। মুসা ওর হাঁটুতে পা রেখে কাঁধে উঠে দাঁড়াল, এখন হাত বাড়ালেই সানশেডটা ধরতে পারে, এমন সময় ঘটল অভাবিত ব্যাপারটা।

ওদের একদম কানের কাছে মোটা, কর্কশ একটা গলা বলে উঠল, 'অ্যাই, কারা তোমরা? এখানে কী করছ!'

ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল ওদের। আতঙ্কিত হয়ে কাঁধের বোঝার কথা ভুলে দৌড় দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াতে গেল রবিন, দুলে উঠল মুসা।

কিছুক্ষণ সার্কাসের দড়াবাজের মত দু'দিকে হাত মেলে দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইল। ব্যর্থ হয়ে তাল হারিয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল ভেজা মাটিতে।

কাঁধে বেকায়দা চাপ পড়তে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রবিন। এক মুহূর্ত পর ও-ও পড়ল চিৎপটাং হয়ে।

কিশোর উপরের সানশেডে জমে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাব দেখে মনে হচ্ছে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

'কারা তোমরা?' ধমকে উঠল সে কণ্ঠ। 'কথা বলছ না কেন? কী করছ এখানে?'

ভাষা জোগাল না কারও মুখে।

এগারো

'কারা তোমরা?' আবার কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল লোকটা। 'কী করছ এখানে?'

উপর থেকে প্রমাদ গুনল কিশোর। দেখেই চিনতে পেরেছে লোকটাকে—এ পাড়ার নাইটগার্ড।

কী জবাব দেবে, ভাবতে শুরু করল কিশোর।

ওদিকে রবিনের অবস্থা শোচনীয়। আছাড় খেয়ে কেটে গেছে ওর কপাল।

'ঠিক আছে,' লোকটা বলল। 'আমি লোকজন ডাকছি। তারা তোমাদেরকে ধরে পুলিশে দেবে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' কিশোর বলল। 'এখনই কিছু করতে যাবেন না। আগে আমাদের কথা শুনে নিন।'

'কী শুনব?' গার্ড বলল। 'দেখে তো তোমাদেরকে ভদ্র ঘরের ছেলে মনে হয়। কিন্তু এত রাতে...'

'আপনি ভুল লাইনে ভাবছেন,' কিশোর বলল।

'কী?'

'বলছি আপনি ভুল ভাবছেন আমাদেরকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' মুসা সায় দিল। 'আমরা চুরি করতে আসিনি।'

'তা হলে কেন এসেছ?' কোমরে এক হাত রাখল গার্ড। অন্য হাতে মোটা একটা বেত। 'ওর কপাল কাটল কী করে?' রবিনকে দেখাল।

এই প্রথম ব্যাপারটা খেয়াল করল কিশোর ও মুসা।

'আরে, তাই তো!' চমকে উঠল মুসা। 'ওখানে কাটল কী করে, রবিন?'

হাত তুলে কাটা জায়গাটা ছুঁয়ে দেখল রবিন। জ্বালা করছে। ব্যথায় ভুরু কোঁচকাল। 'পড়ে গিয়ে,' বলল। 'ইঁটের কোনায় লেগেছে।'

গার্ডের দিকে ফিরল মুসা। 'আমরা এসেছিলাম ম্যাজিস্ট্রেট আঙ্কেলের ভাতিজিকে একটা জরুরী খবর দিতে।'

'কাকে?'

'এই বাড়ির মালিকের ভাইয়ের মেয়েকে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমাদের খবর দেয়ার কায়দাটা বিদঘুটে। আসলে কেন এসেছ তোমরা? দু'জন নীচে, একজন সানশেডে, ব্যাপার কী?' রীতিমত চ্যালেঞ্জের সুরে বলল লোকটা।

দু'পা এগিয়ে এল রবিনের দিকে। বেতটা শক্ত করে ধরেছে, প্রয়োজন দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করবে। 'অবশ্যই কোনও বদ মতলব আছে তোমাদের। চুরি করার...'

'ভুল ভাবছেন,' বলল কিশোর। 'আমাদের দেখে আপনার চোর-ডাকাত মনে হয়?'

রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল গার্ড। 'চোর দেখে চেনা যায়? চোরের গায়ে "চোর" কথাটা লেখা থাকে?'

'আসলে ম্যাজিস্ট্রেট আঙ্কেলের ভাইজিকে একটা বিপদের ব্যাপারে সাবধান করতে এসেছি আমরা,' বলল কিশোর।

'বিপদ!' গা জ্বালানো ভঙ্গিতে বলল গার্ড। 'আমি তো তোমাদেরকে ছাড়া আর কোনও আপদ দেখছি না এখানে।'

কিশোর সানশেড ধরে ঝুলে পড়ল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। দৃঢ় পায়ে গিয়ে গার্ডের মুখোমুখি দাঁড়াল।

ভঙ্গিটা বেপরোয়া।

'আমরা যে বিপদের কথা বলছি,' থেমে থেমে বলল। 'তা আপনি ভুলেও কখনও শোনেননি।'

বেত উঁচু করল গার্ড। 'কী বলবে বলো, বেয়াদব ছোকরা, নইলে পুলিশে দেব।'

'আমরা বেয়াদব নই,' শান্ত গলায় বলল কিশোর। 'চুরি ডাকাতি করতেও আসিনি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল লোকটা, এই সময় নীচের একটা জানালা খুলে গেল।

শ্যারনকে দেখা গেল সেখানে।

'কে এখানে?' বলল, পরক্ষণে বিস্ময়ে গলা চড়ে গেল। 'কিশোর! রবিন–মুসা, তোমরা! এত রাতে এখানে কী করছ তোমরা?'

ওদের তিনজনকে মেয়েটা ভাল করেই চেনে, একটু থমকে গেল গার্ড লোকটা।

নীরব বিস্ময়ের সাথে একবার ওদেরকে, একবার শ্যারনকে দেখল।

শ্যারনের দিকে ফিরল কিশোর। 'কপাল খারাপ,' বলল। 'তোমাকে একটা জরুরী খবর দিতে এসে...'

'এত রাতে এমন কী জরুরী খবর দিতে এলে!' শ্যারন বলল।

'ইশশশ! বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে... এসো, ভেতরে এসো।'

গার্ডের উপর চোখ পড়ল শ্যারনের। 'আপনি কে?'

'আমি মহল্লার নাইট গার্ড,' লোকটা বেত তাক করল তিন গোয়েন্দার দিকে। 'তুমি এদেরকে চেনো?'

'হ্যাঁ, এরা আমার বন্ধু।'

লোকটার দিকে ঘুরল কিশোর। 'এবার নিশ্চয়ই সন্দেহ গেছে আপনার?'

কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করল লোকটা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল রাস্তার দিকে।

ততক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছে শ্যারন। বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল শ্যারন। এখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। 'কী হয়েছে? নতুন কোনও কেস পেয়েছ?'

'বলতে পারো,' বলল কিশোর।

'আমি এখানে আছি জানলে কী করে তোমরা?' বলল শ্যারন।

কিশোর বলল, 'গতকাল তুমি না বললে চাচার বাসায় থাকবে রাতে?'

'আমি বলেছি? তা-ই হবে বোধহয়, মনে নেই। আচ্ছা, বেশ, আসল ঘটনা বলো এবার।'

লম্বা করে দম নিয়ে শুরু করল কিশোর। বিকেলে মুসার সঙ্গে হঠাৎ মেডিক্যাল কলেজে যাওয়া, সেখান থেকে মর্গ দেখতে যাওয়া, সব খুলে বলল।

'মর্গ!' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল শ্যারন। 'মর্গে গিয়েছিলে তোমরা সবাই মিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য! আমাকে নিলে না কেন!'

'দাঁড়াও, শ্যারন,' হাত তুলে বাধা দিল কিশোর। 'আগে সব শুনে নাও। সব শুনলে চমকে যাবে।'

'তাই?' ধপ করে সোফায় বসে পড়ল শ্যারন।

'হ্যাঁ।' শুরু করল কিশোর।

কিন্তু দু'মিনিট যেতে না যেতে ফের বাধা। 'অ্যাঁ?' দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল শ্যারনের। 'লাশ উঠে বসল! কী বলছ!'

'ঠিকই বলছি, শ্যারন।'

'যাহ্, আমার বিশ্বাস হয় না। তা-ই কোনওদিন হয় নাকি?'

অধৈর্য না হয়ে বলল কিশোর, 'কোনওদিন হয় কি না জানি না। কিন্তু আজ হয়েছে। সেজন্যেই এই ঝড়বৃষ্টির ভিতর ছোটাছুটি করে বেড়াতে হচ্ছে আমাদেরকে।'

'কেন?' বলল শ্যারন। 'ওটার সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক?'

'সে কথা কিশোর বলার চেষ্টা করছে তখন থেকে,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'কিন্তু তুমি বলতেই দিচ্ছ না।'

'ও, দুঃখিত। বলো, কিশোর, আর বাধা দিচ্ছি না।' নড়েচড়ে আরাম করে বসল শ্যারন।

'লোকটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক সন্ত্রাসী,' শুরু করল কিশোর। 'নাম হেক্টর। কিন্তু সবাই চেনে মুরগি-ছিলা হেক্টর নামে।'

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল শ্যারন। বলে উঠল, 'কী নাম বললে? মুরগি-ছিলা হেক্টর? নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় যেন শুনেছি।'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'এ এলাকারই মাস্তান লোকটা। এক সময় বাজারে মুরগি জবাই করত, চামড়া ছেলার কাজ করত।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কয়েক মাস আগে এর জামিন বাতিল করে দিয়েছিলেন আমার চাচা। জেল হয়েছিল লোকটার।'

'তার কথাই বলছি। আরেক সন্ত্রাসী কাসলার আজ গুলি করে ওকে মেরে ফেলতে চায়। মেডিক্যালের মর্গে রাখা ছিল তার লাশ। আমরা মর্গ দেখতে গিয়ে দেখি...'

'জ্যান্ত হয়ে উঠেছে,' বাধা দিয়ে বলল মুসা।

সন্দেহের চোখে তিনজনকে দেখল শ্যারন। 'তা কী করে সম্ভব!'

'কী করে যে সম্ভব, সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন।'

'কিশোর, আমি একটা কথা ভাবছি।'

'কী?'

'ভাবছি তোদের দেখায় কোনও ভুল হয়নি তো?'

দু'হাতের তালু চিত করে অসহায় ভঙ্গি করল কিশোর। 'লোকটার সঙ্গে আমরা তিনজন কথা বলেছি, শ্যারন। তার মুখেই সব ঘটনা শুনেছি। কার কার ওপর তার রাগ, কাকে কাকে খুন করতে চায়, সব নিজ মুখে বলেছে আমাদেরকে।'

'তা-ই নাকি?' ভুরু কুঁচকে উঠল শ্যারনের। চিন্তিত।

'হ্যাঁ, তিনজনকে খুন করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে মুরগি-ছিলা হেক্টর।'

'কাকে কাকে?'

'একজন ওয়ার্ড কমিশনার মিস্টার মরগান,' কিশোর বলল। 'খুব সম্ভব তাকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলেছে।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠল শ্যারন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এ ব্যাপারে সাবধান করার জন্যে ওঁর বাসায় টেলিফোন করেছিলাম আমি মর্গ থেকে।'

'তারপর?'

'ওঁর স্ত্রী ফোন ধরেছিলেন, মহিলা পাত্তা দেননি আমাকে।'

অবাক হলো শ্যারন। 'উপকার করতে গেলে কেউ ওরকম করে নাকি?'

'উনি আমাকে বিশ্বাস করেননি বলে বকেছেন। পুলিশে ফোন করেছিল মুসা, ওরাও বিশ্বাস করেনি। তখন আমি রকি বিচ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে জানিয়েছি। কিন্তু তাঁরা কতটা কী করতে পারবেন জানি না।'

'আসল কথা বলো!' তাড়া দিল মুসা। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'আর কী বলবে?' ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল শ্যারন, তারপর কিশোরকে বলল, 'কীসের দেরি, কিশোর? একটা কেস পেয়েছ এ-ই তো?'

খুক করে কাশল কিশোর। 'ওর প্রতিশোধের তালিকায় তোমার চাচাও আছেন।'

দু'চোখ বড় হয়ে উঠল শ্যারনের। 'আমার চাচ্চু!'

'হ্যাঁ,' মুসা মাথা দোলাল।

'কেন!'

'কারণ উনি জামিন বাতিল করে হেক্টরকে জেলে পাঠিয়েছিলেন,' কিশোর বলল। 'তাই ওঁকেও খুন করার শপথ নিয়েছে সে।'

'বলো কী!' সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল শ্যারন।

'হ্যাঁ। যে-কোন মুহূর্তে এখানে এসে হাজির হবে লোকটা,' বক্তব্য শেষ করল কিশোর। 'এ খবরটা জানাতে কতবার যে ফোন করেছি, তোমাকে পাইনি। প্রত্যেকবার এনগেজড ছিল ফোন।'

'ক-কখন ফোন করেছিলে?'

'কখন মানে?' বলল মুসা। 'অন্তত দু'ঘণ্টা আগে যোগাযোগ করতে চেয়েছি আমরা। তখনও কথা বলছিলে, এখানে এসে দেখি এখনও ফোনে কথা বলছ।'

লজ্জা পেল শ্যারন। 'ইয়ে... সত্যিই দুঃখিত।'

'কার সাথে অত কথা বলছিলে?' মুসা জানতে চাইল।

'নওরিন ফোন করেছিল একবার। একটু আগে করেছিল ফারা স্টিভেনসন। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার ব্যাপারে...'

কিশোর বলল, 'শ্যারন, এখন এসবের সময় নেই। যে-কোনও মুহূর্তে হাজির হবে হেক্টর। তার আগে...'

'কিন্তু চাচ্চু তো নেই বাড়িতে,' বলল শ্যারন।

'জানি। কিন্তু হেক্টরের তা জানা নেই। সে যদি এসে দেখে উনি নেই, তখন হয়তো রেগেমেগে...' আর কিছু বলার সুযোগ পেল না কিশোর।

শ্যারনের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে চমকে উঠল ভীষণভাবে।

ওর পিছনের একটা জানালার দিকে চেয়ে চেঁচাচ্ছে শ্যারন।

চট করে সেদিকে ঘুরল কিশোর-রবিন-মুসা।

আতঙ্কে ঘাড়ের সমস্ত চুল দাঁড়িয়ে গেল ওদের দৃশ্যটা দেখে।

এসে গেছে মুরগি-ছিলা হেক্টর!

বাইরে থেকে জানালার কাঁচে মুখ ঠেকিয়ে ওদের দিকেই চেয়ে আছে।

দু'চোখে রাজ্যের জিঘাংসা।

কেন যেন লোকটার মুখের চামড়ার রঙ পাল্টে গেছে। নীল হয়ে উঠেছে। কপালে, গালে কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন।

চোয়াল হাঁ করে রেখেছে।

ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে জিভ। একদম কালো রঙ।

বুকের ভিতর থেকে উঠে আসা চিৎকার ঠেকাতে মুখে হাত চাপা দিল শ্যারন।

কিশোর বুঝতে পেরেছে মৃতের মত দেহ গলতে শুরু করেছে হেক্টরের।

ওদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে গলছে সে।

চিল চিৎকার ঠেকাতে ব্যর্থ হলো শ্যারন। কেঁপে উঠল নিস্তব্ধ রাত।

বারো

শ্যারন সজোরে চেপে ধরে আছে নিজের মুখ।

চিৎকার ঠেকানো গেছে তাতে। কিন্তু গোঁ গোঁ শব্দ ঠিকই বের হচ্ছে।

একেকটা চোখ রসগোল্লা হয়েছে ওর।

এখন আর হেক্টরের মুখটা নেই জানালায়।

সরে গেছে।

কিন্তু কিশোর জানে লোকটা আছে।

খালি হাতে ফিরে যাবে বলে আসেনি মুরগি-ছিলা হেক্টর।

'ওর... ওর মুখটা দেখেছ?' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'কেমন করে পচে গলে যেতে শুরু করেছে?'

'দেখেছি,' মুসা মাথা দোলাল। শিউরে উঠল ঘৃণায়। 'হায় আল্লা! কী ভয়ঙ্কর!'

'হাতের কাছে যে যা পাও, তাই নিয়ে প্রস্তুত হও,' কিশোর বলল।

'জলদি!'

এক দৌড়ে দেয়ালে ঝোলানো চাচার ভারী টেনিস র‍্যাকেটটা পেড়ে নিল শ্যারন।

'ধরো, কিশোর!' জিনিসটা ছুঁড়ে দিল।

ক্যাচ ধরল কিশোর। ওজন বুঝে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

ওদিকে মুসা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা মাছ ধরার ছিপ তুলে নিল। ওটার ভারী গোড়ার দিকটা দু'হাতে মুঠো করে ঘোরাল কয়েকবার।

'ওটা আমাকে দাও,' কিশোর বলল। 'একটা কাজ করব।'

'কী কাজ?'

জবাব না দিয়ে ছিপটা নিল কিশোর। দরজার একপাশে, দু'পাশের দুই ফ্রেমের সাথে সুতো বাঁধার মত জায়গা খুঁজতে লাগল।

নেই তেমন জায়গা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিল কিশোর।

'কী করতে চেয়েছিলে?' প্রশ্ন করল রবিন।

'ট্রিপ ওয়ায়্যার।'

'সেটা কী?'

'হাঁটার পথে শক্ত সুতো বা তার শক্ত করে বেঁধে রাখা। যাতে পায়ে বেধে পড়ে যায় শত্রু। একটা ছবিতে দেখেছিলাম কায়দাটা।'

'শোনো, কিশোর,' শ্যারন বলল। 'ওকে যদি বলা হয় চাচ্চু বাড়িতে নেই তা হলে হয়তো...'

'লাভ নেই, শ্যারন,' বলল কিশোর। 'ও অত কিছু বুঝতে চাইবে না। এখন খুন চেপে আছে মাথায়।'

কোথাও কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে আঁতকে উঠল ওরা।

তারপরই ভারী একটা দেহের লাফিয়ে পড়ার শব্দ।

তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল শ্যারন। 'ভেতরে ঢুকে পড়েছে ওটা! কিচেন দিয়ে ঘরে...'

'দোতলায় চল সবাই!' কিশোর তাড়া দিল। 'সবাই ওপর তলায়, জলদি!'

শ্যারনের হাত ধরে প্রায় অন্ধকার সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল মুসা। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যেতে লাগল ওরা।

রবিন আর কিশোরও ছুটল।

কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে থেমে পড়ল কিশোর। ছিপের হুইলের থেকে সুতো খুলে আঁকাবাঁকা করে পেঁচিয়ে বাঁধতে লাগল সিঁড়ির দু'দিকের রেলিঙে।

হাঁটু সমান উঁচুতে।

সিঁড়ি দিয়ে যে উঠতে চাইবে, তার বেশ সমস্যা হবে এই ফাঁদ থেকে বেরুতে।

কাজ শেষ হতে উঠে পড়ল কিশোর।

সন্তুষ্ট।

'এবার বেডরুমে চলে যাও সবাই। ভারী যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে তৈরি থাকতে হবে। পেপার ওয়েট, ভারী বই, যা আছে।'

'ওসব দিয়ে কী হবে?' শ্যারন বলল।

'ওপর থেকে ছুঁড়ে মারব উঠতে দেখলে।'

তা-ই করল ওরা সবাই।

ধারেকাছে যতগুলো ঘর ছিল, সবগুলো থেকে ছোটখাট যা পাওয়া গেল, নিয়ে এসে জড় করল সিঁড়ির মাথায়।

কাজ সেরে কিছু বলতে যাচ্ছিল শ্যারন, কিন্তু নীচ থেকে একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে আসতে আঁতকে উঠে থেমে গেল।

হেক্টরের গলা এ মুহূর্তে মোটেই মানুষের কণ্ঠ বলে মনে হলো না। যেন ক্ষিপ্ত কুকুর একটা।

'দাদী!' হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল শ্যারন। 'ওঁর ঘুম ভাঙাতে হবে তাড়াতাড়ি।'

'ভাঙাতে হবে না,' মুসা বলল। 'এরকম কুকুরের ডাক আরও কয়েকটা শুনলে তোমার দাদীর ঘুম এমনিতেই ভাঙবে।'

'ভাঙবে না। ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হয় তাঁকে। সহজে ভাঙে না তাঁর ঘুম।'

'মস্ত ঝামেলার মধ্যে পড়েছি তো!' বলল মুসা।

'মই-টই কিছু আছে?' কিশোর বলল।

শ্যারন মাথা নাড়ল। 'মই নেই। তবে পেছনদিকে আরেকটা সিঁড়ি আছে।'

করিডরের ওদিকে বন্ধ একটা দরজা দেখাল। অন্ধকার জায়গাটা। 'কিন্তু ওটা দিয়ে যেতে হলে কিচেন পার হতে হবে।'

'সবার বেরিয়ে যেতে সময় লাগবে,' মুসার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল কিশোর। 'তুমি এখানে থাকো শ্যারনের সঙ্গে। দু'জনে চেষ্টা করবে হেক্টরকে যতক্ষণ সম্ভব ঠেকিয়ে রাখতে। পারবে না?'

'পারব,' শুকনো স্বরে বলল মুসা।

'ঘোঁৎ!' জাতীয় একটা শব্দে একযোগে ঘুরে চাইল ওরা। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছে হেক্টর।

মুখ তুলে ওদের চারজনকে দেখল সে। আরেকবার 'ঘোঁৎ!' করে উঠল।

বেয়াড়াগুলোকে হাতের কাছে দেখতে পেয়ে দ্রুত পায়ে উঠে আসার চেষ্টা করল।

কিন্তু দু'পা উঠেই কিশোরের পাতা ফাঁদে পা দিল, দড়াম করে আছড়ে পড়ল।

ব্যথা আর হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল আবার।

মত পাল্টাল কিশোর। ভেবেছিল মুসা আর শ্যারনকে দিয়ে কিছু সময় ব্যস্ত রাখবে মুরগি-ছিলাকে।

সেই ফাঁকে রবিন আর ও নিজে শ্যারনের দাদীকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেবে।

তার বদলে এখন ঠিক করল, এখানে থাকবে রবিন আর ও। কিন্তু শ্যারন ওর বুদ্ধিটা পছন্দ করল না।

'না, না!' বলল। 'তোমাদেরকে এই বিপদের মুখে ফেলে আমি যেতে পারি না। এ অসম্ভব!'

'শ্যারন!' গলা চড়ে গেল কিশোরের। 'সময় নেই, যা বলছি তাই করো। দাদীকে নিয়ে পালাও তাড়াতাড়ি।'

এবার কাজ হলো। ওর কথা মেনে নিল শ্যারন।

একটু আঁইগুঁই করল মুসা। 'আমি না হয় থাকি এখানে...'

'তর্ক কোরো না,' ধমক মারল কিশোর। 'ওর দাদীকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হতে পারে। রবিন বা আমার গায়ে অত জোর নেই।'

শেষবারের মত সিঁড়ির দিকে চেয়ে ঘুরে দাঁড়াল শ্যারন। 'এসো, মুসা। দাদুকে নিয়ে সরে পড়ি আমরা। কিন্তু সাবধান! জোরে ডেকো না দাদীকে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে তাঁর আবার বুক ধড়ফড় করে।'

'এত শব্দেও তোমার দাদীর ঘুম ভাঙেনি, এখন কী আর ভাঙবে? শেষ পর্যন্ত কাঁধে করে বয়ে নিতে হয় কি না...' বিড়বিড় করে বলল মুসা। চিন্তিত।

করিডর ধরে দাদীর বেডরুমের দিকে চলল শ্যারন।

মুসা ওর পিছন পিছন চলেছে।

এদিকে আবার সিঁড়িতে আছাড় খেল মুরগি-ছিলা। কেবল সুতোয় বেধেই নয়, নিজের ভেজা কাপড়ের পানিতে সিঁড়ি ভিজিয়ে ফেলেছে সে। এবারের আছাড় তার ফলেই খেয়েছে।

পড়েই প্রচণ্ড আক্রোশে আবার চিৎকার করে উঠল।

'উঠে আসুক!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'আরও চমক নিয়ে অপেক্ষা করছি আমরা।'

গায়ের কাছে পড়ে থাকা জিনিসপত্রের মধ্য থেকে শ্যারনের চাচার একটা ভারী পেপারওয়েট তুলে নিল কিশোর।

হেক্টরের মাথা সই করে ছুঁড়ল। আবছা আঁধারে ছোঁড়া হয়েছে বলে লাগল না জিনিসটা, তার পায়ের কাছে ড্রপ খেয়ে চলে গেল নীচে।

চমকে উঠে মুখ তুলে দেখল লোকটা।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্কর ভঙ্গি করল। কালো জিভটা বেরিয়ে এসেছে।

ওদিকে দু'দিক থেকে শ্যারনের দাদীকে ধরে করিডরে বেরিয়ে এল শ্যারন আর মুসা। হুঁশ নেই দাদীর—ওষুধের ঘোর কাটেনি।

'আমরা গেলাম!' কিশোরের উদ্দেশে বলল শ্যারন।

'যাও। সোজা তোমাদের বাসায় গিয়ে ফোন করবে পুলিশে।'

'আচ্ছা। কিন্তু তোমরা?'

'আমাদের কথা ভেবো না। তাড়াতাড়ি যাও,' বলতে বলতে একটা ফ্রিসবি তুলে নিল কিশোর। শ্যারনের চাচাতো ভাইয়ের ওটা। হেক্টরের মাথা তাক করে ছুঁড়ল জিনিসটা। 'আর শ্যারন, পারলে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে চেষ্টা কোরো!'

এবার ফ্রিসবি লাগল। রাবারের জিনিস বলে ব্যথা পেল না বটে, কিন্তু চমকে উঠল হেক্টর।

ঘোঁৎ করে উঠল। সুতোর ফাঁদের মধ্যে পা ফেলার জায়গা খুঁজতে লাগল ব্যস্ত হয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে আসতে চাইছে।

পা বাড়াল শ্যারন ও মুসা, দু'জনে শ্যারনের দাদীকে প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে পিছনের সিঁড়ির দিকে চলে গেল। আবছা আঁধারে খানিক যেতেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

শেষ মুহূর্তে ওদেরকে দেখে ফেলল হেক্টর। দুর্বোধ্য এক চিৎকার ছাড়ল। শ্যারনের চাচার দামী একটা ফ্ল্যাশ লাইটও এনেছিল ওরা, জিনিসটা কাজে লাগাবে ঠিক করল কিশোর।

শুধু ড্রইং রুমে আলো জ্বলছে এ বাড়ির, ফলে সব ঠিক দেখা যাচ্ছে না। আলো দরকার।

'ফ্ল্যাশলাইটটা দাও তো!' রবিনকে বলল কিশোর।

'কী করবে?' জিনিসটা তুলে নিল রবিন। ধরিয়ে দিল বন্ধুর হাতে।

এবার ছিপের হুইলের শেষ সুতোটুকু হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল কিশোর।

ফ্ল্যাশলাইট বাঁধল মজবুত করে, তারপর ওটার সুইচ অন করে রেলিঙের ওপাশ দিয়ে একটু একটু করে নীচে নামিয়ে দিল। 'মুরগি-ছিলার নজর অন্যদিকে সরাতে হবে।'

উঁকি দিয়ে নীচে চাইল রবিন। দেখতে পেল সুতোটা একটু একটু করে দোলাচ্ছে কিশোর, আগুপিছু করছে আলো। দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন ওটা হাতে নিয়ে হাঁটছে।

কাজে লাগল কৌশলটা।

আলো চোখে পড়তে প্রচণ্ড এক চিৎকার ছাড়ল হেক্টর, ধুপধাপ শব্দে নেমে গেল সিঁড়ি থেকে। ওটার দিকে ছুটল।

সময়মত সুতো টেনে বাতি তুলে নিল কিশোর, খানিক পর আবার নামাল।

কিন্তু এবার আর কাজে লাগল না কৌশল। ওদের চালাকি ধরে ফেলেছে লোকটা।

বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে ছুটে আসছে।

'রবিন!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'পালাও পেছন সিঁড়ি দিয়ে!'

হুড়মুড় করে ছুটল রবিন। পিছন পিছন কিশোর।

কিন্তু কয়েক পা যেতেই পিছনে হেক্টরকে গড়িয়ে পড়তে শুনে থেমে পড়ল।

আওয়াজটা বেশ জোরেই হলো।

চলল বেশ কিছুক্ষণ।

কিশোরকে থেমে পড়তে দেখে রবিনও থামল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কী হলো, কিশোর?'

'মামলা খতম,' কিশোর বলল।

'কী হয়েছে?'

'তা জানি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'দেখতে পাইনি ঠিকমত। তবে আর আমাদের বিরক্ত করবে বলে মনে হয় না। যেভাবে সিঁড়ির মাথা থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছে, হয়তো ভেঙেই গেছে ঘাড়।'

পিছনের আঙিনায় বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

'বাইরে থেকে দরজা-জানালা বন্ধ করে লোকটাকে ভেতরে আটকে রাখতে পারলে ভাল হত,' রবিন বলল।

'কী দরকার?' জবাব দিল কিশোর। 'আর জেগে উঠছে না। জ্ঞান হারিয়েছে বোধহয়।'

আতঙ্কের শীতল একটা ধারা রবিনের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল নীচের দিকে। 'কিন্তু, কিশোর,' একটু আগে ঘরের মধ্যে হাঁটাচলার শব্দ শুনতে পেয়েছে ও। 'লোকটা মারা গেছে বললে না? ও তো দিব্যি নড়াচড়া করছিল নীচে।'

তেরো

কিছু বলতে যাচ্ছিল কিশোর, কিন্তু সময় হলো না রবিনের চিৎকারে। 'কিশোর! তোমার পেছনে... সাবধান!'

চমকে গেছে কিশোর। প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে জায়গা থেকে সরে গেল। আরেকটু হলে পড়ে যেত।

একই মুহূর্তে পিছনে কাঁচ ভাঙার বিকট শব্দ উঠল, পর মুহূর্তে বড়সড় একটা ছায়া লাফ দিল।

তারস্বরে সাবধান করল রবিন।

সামলে নিয়ে ঘুরে চাইল কিশোর।

আঁতকে উঠল পিছনের দৃশ্য দেখে।

ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মুরগি-ছিলা হেক্টর। দেখে মনে হয় কিছুই হয়নি তার এত বড় পতনে।

বেরিয়ে এসেই কিশোরকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল সে, কিন্তু সময়মত লাফিয়ে সরে গেছে কিশোর।

ওদিকে কিশোরকে সাবধান করতে গিয়ে নিজের নিরাপত্তার কথা বোধহয় ভুলে গিয়েছে রবিন। জায়গা ছেড়ে পিছাতে দেরি করে ফেলেছে।

সুযোগটা হাতছাড়া করেনি মুরগি-ছিলা হেক্টর।

কিশোরকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে পরক্ষণে দিক বদলে রবিনের দিকে ঝাঁপ দিয়েছে সে।

খপ করে রবিনের জ্যাকেটের কলার মুঠো করে ধরে ফেলেছে পিছন থেকে।

রাস্তার আলোয় লোকটার ওই মূর্তি দেখে চমকে গেল কিশোর।

রবিন তার মুঠো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে।

'তোমার জ্যাকেট, রবিন!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জ্যাকেট খুলে ফেলো! দৌড় দাও!'

তাই করল রবিন।

জোর এক ঝাঁকি মেরে কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে দিল জ্যাকেট।

একটানে সড়াৎ করে হাতদুটো বের করে এনেই প্রকাণ্ড এক লাফে হেক্টরের নাগালের বাইরে চলে গেল।

আড়ষ্ট পায়ে ওর দিকে এগোল হেক্টর, কিন্তু আরেক লাফে তার নাগালের বাইরে চলে গেল রবিন।

ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ল সন্ত্রাসী।

রবিনের জ্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে আরও কয়েক পা এগোল।

এবার রাস্তার আলো সরাসরি পড়ল ওর গায়ে। আলোয় বুকের ডানদিকে তাজা রক্তের ধারা বইতে দেখল কিশোর।

এটা নতুন ক্ষত!

নিশ্চয়ই কাসলারের কীর্তি।

এতকিছুর পরও দু'পায়ে খাড়া আছে কী করে, ভাবতে গিয়ে অবাক না হয়ে পারল না কিশোর।

দু'চোখ আরও লাল হয়ে উঠেছে হেক্টরের। জ্বলন্ত অঙ্গার যেন দু'টুকরো—ধকধক করছে।

দেখলে কলজের পানি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। প্রচণ্ড ঘৃণা গলগল করে ঝরে পড়ছে তার দু'চোখ থেকে।

'রবিন, পালাও!' পিছনের লন ধরে ছুটল কিশোর। ইচ্ছে পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার। ওর এই হঠাৎ নড়ে ওঠায় রবিনের উপর থেকে নজর সরে গেল সন্ত্রাসী হেক্টরের, কিশোরের উপর পড়ল।

একটা অস্ফুট হুঙ্কার ছেড়ে ওর দিকে এগোল সে।

বুক কাঁপছে কিশোরের। এক দৌড়ে পিছনের গেটে এসে পৌঁছল। এদিকে একটা গেট আছে। ছোট, তবে তালা মারা।

হতাশ হতে হলো কিশোরকে। 'গেটে তালা মারা, রবিন!' চেঁচিয়ে বলল। 'খুলতে পারব না!'

উল্টোদিকে দৌড় দেয়ার জন্যে পা তুলেছিল রবিন, আঁতকে উঠল ঘটনা দেখে। এখনই কিশোরকে ধরে ফেলবে শয়তানটা।

কিছু একটার খোঁজে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল রবিন। আর

কিছু না পেয়ে বাগানের ইঁট বিছানো রাস্তা থেকে আস্ত একটা ইঁট তুলে নিল দু'হাতে। লোকটার পিছনে নিঃশব্দে যেতে চাইছে। দু'হাত বাকি থাকতে ইঁট মাথার উপর তুলে ধরে ডাকল, 'অ্যাই! দেখো! ধরো এটা!' বলে ওটা ছুঁড়ে মারল।

ঘুরে চাইতে যাচ্ছিল মুরগি-ছিলা, কিন্তু পারল না। তার আগেই দড়াম করে ইঁট এসে পড়ল তার পিঠে। দুলে উঠল সে।

ব্যথায় কাতরে উঠল। থ্যাপ শব্দে ভেজা মাটিতে আছড়ে পড়ল ইঁট। এক হাতে ব্যথা পাওয়া জায়গাটা ধরার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু জায়গামত পৌঁছল না হাত।

দিক বদলে রবিনের দিকে ফিরল হেক্টর। তাকে কয়েক পা যেতে দিল কিশোর, তারপর সামনে পড়ে থাকা ইঁটটা তুলে নিল।

'কী করছ?' রবিন বলল। পিছাতে শুরু করেছে।

'এবার আমি সামলাচ্ছি,' জবাব দিল কিশোর। 'তুমি দৌড় দাও। শ্যারনরা বেশি দূর যেতে পারেনি, ওদের সঙ্গে...'

'আর তুমি? তুমি কী করবে?'

'আমি? দেখি কী করা যায়!'

লোকটার কাছাকাছি চলে গেল কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে ফিরল মুরগি-ছিলা হেক্টর। এগুতে শুরু করেছে। পিছাতে লাগল কিশোর। খেপে উঠেছে লোকটা, তেড়ে ধরতে চাইছে ওকে। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হতে হচ্ছে।

দূরে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। বিপদে বন্ধুকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।

ওদিকে হেক্টরকে নিয়ে এতই ব্যস্ত কিশোর, কখন যে বড়সড় এক ডোবার কাছে চলে এসেছে, খেয়াল করেনি।

ঠিক ডোবা নয় ওটা, ছোটখাট একটা পুকুরই বলা যায়। মাছ চাষের শখ হওয়ায় শ্যারনের চাচা বাড়ির পিছনে খনন করেন পুকুরটা। প্রচুর মাছ ছাড়া হয়েছে ওটায়। মাছ ধরার জন্য জালের ব্যবস্থাও করেছেন। পুকুরের পাড়ে আড়ার সাথে ঝুলছে সেটা।

'সাবধান, কিশোর!' দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'পেছনে

পুকুর, পড়ে যাবে!'

আঁতকে উঠল কিশোর। পাশে এক লাফে সরে গেল। এমন সময় জালে উপর চোখ পড়ল রবিনের। বুদ্ধিটা তখনই মাথায় এল। দৌড়ে গিয়ে টান মেরে আড়া থেকে জাল পেড়ে নিল, রকি বিচের মৎস্যজীবী ভ্যালমারের শেখানো কায়দায় মুরগি-ছিলাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল।

মাথার উপর নরম কিছুর আভাস পেয়ে ঘোঁৎ করে উঠল হেক্টর। ঘুরে দেখতে গেল ওটা কী। কিন্তু ততক্ষণে কাজ হয়ে গেছে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে সে জালে।

মুখ দিয়ে আবার ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ করল মুরগি-ছিলা। পাগলের মত জালের ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে ব্যস্ত হয়ে।

ফল হলো উল্টো। নিজেকে আরও ভালমত পেঁচিয়ে ফেলল সে। পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

তারপর এক গড়ান দিয়ে ঝপাৎ করে গিয়ে পড়ল পুকুরে।

'এবার পেয়েছি!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ওদিকে পানিতে পড়ে অসহায়ের মত হাঁচড়-পাঁচড় করছে মুরগি-ছিলা। পুকুরের বুক সমান পানি, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ছে। মরিয়া হয়ে জাল ছাড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না।

নরম কাদায় এলোপাতাড়ি লাফালাফি করতে গিয়ে নিজেই বরং কাজটাকে বহুগুণ জটিল আর দুঃসাধ্য করে তুলেছে।

'বেশ বড় মাছ ধরেছ তো!' ঠাট্টা করে বলল কিশোর। 'এবার কী করা যায়...'

'টেনে তুললে কেমন হয়?' বলল রবিন।

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই মুসার গলা শোনা গেল। 'কিশোর! রবিন! তোমরা কোথায়?'

'এই যে এখানে,' কিশোর গলা উঁচু করে বলল। 'পেছনের বাগানে।'

'ও-ওটা কোথায়?'

'এদিকে।'

বাড়ির কোনা থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল মুসা। ওদেরকে পুকুর পাড়ে দেখে অবাক হলো। 'ওখানে কী করছ তোমরা?'

'মাছ ধরছি,' কিশোর হেসে বলল। 'দেখে যাও।'

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল মুসা। ব্যাপার দেখে খুশিতে হেসে ফেলল। 'এ তো দারুণ কাণ্ড! খাইছে!'

'এসো, ওকে টেনে তুলতে হবে,' বলল কিশোর।

'শ্যারন আর দাদী কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'এতক্ষণে গাড়ি নিয়ে বাসায় পৌঁছে গেছে। আমি কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসেছি।'

ওদের সাথে যোগ দিল মুসা। জালের রশি ধরে টেনে মুরগি-ছিলাকে উপরে তোলার চেষ্টা করল সবাই মিলে। কিন্তু হচ্ছে না। খুব ওজন লোকটার। দড়ির গোড়ার দিকে এগিয়ে গেল মুসা, পা মাটিতে ঠেকিয়ে, 'দে টান, হেঁইও!' বলে টান দিল গায়ের জোরে।

সুবিধে হলো না। উল্টো টান লাগায় বরং ওর পা-ই পিছলে গেল। ঢালু কিনারা গলে ঝপাং করে পানিতে গিয়ে পড়ল।

পড়েই আঁতকে উঠল মুসা, ভয় হলো এবার ধরে ফেলবে মুরগি-ছিলা। কিন্তু তা করল না লোকটা। সেরকম কিছু করার উপায় নেই। জালে প্যাঁচঘোঁচ লাগিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অসহায়ের মত কেবল গর্জন করছে থেকে থেকে। এক আঙুল নড়ার জো নেই। নিজেই রাখেনি।

ব্যাপার বুঝতে পেরে সাহসী হয়ে উঠল মুসা। আর সাহস ফিরতে বোধশক্তিও ফিরল।

শীতে হি হি করে কেঁপে উঠল। 'খাইছে! পানি কী ঠাণ্ডা রে! শীতে মরে গেলাম!'

'উঠে এসো,' কিশোর বলল। 'এক মরা নিয়েই সমস্যায় আছি। তার ওপর তুমি মরলে ডবল সমস্যা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভুরুতে জমা পানি ঝরাল মুসা। হাসল। 'কিন্তু একে তোলার কী হবে? আমি ঠেলা দিচ্ছি নীচ থেকে, তোমরা টান লাগাও। আশা করা যায় এবার কাজ হবে।'

সত্যিই কাজ হলো। দু'মুখো টান ও ধাক্কায় আলুর বস্তার মত উঠে এল মুরগি-ছিলা হেক্টর।

এবার বেশি বাধা দিল না সে। ঠাণ্ডায় বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। মরা কেঁচোর মত পড়ে থাকল।

মর্গ থেকে আনা রশির খোঁজে পকেটে হাত দিল কিশোর। নেই। কখন পড়ে গেছে খেয়াল করেনি।

'দড়ি দরকার,' কিশোর বলল। 'একে বাঁধতে হবে।'

বাগানে পানি দেয়ার সরু, দীর্ঘ পাইপ দেখে সেদিকে ইঙ্গিত করল রবিন। 'ওটা দিয়ে বাঁধলে কেমন হয়?'

'মন্দ হয় না,' মাথা দোলাল গোয়েন্দা প্রধান।

একটা ট্যাপের সাথে যুক্ত ছিল পাইপটা। মুসা গিয়ে খুলে নিয়ে এল। ওটা দিয়ে কষে বাঁধতে শুরু করল মুরগি-ছিলা হেক্টরকে। একটুও বাধা দিল না সে। এক ফোঁটা শক্তি নেই, বাধা দেবে কী?

কিন্তু ভুল ভেবেছিল ওরা।

পাইপ দিয়ে খানিকটা বাঁধা হতেই নড়াচড়া শুরু করে দিল সন্ত্রাসী। বাঁধতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ল ওরা।

'জলদি বাঁধো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'এবার ছুটে গেলে আর আস্ত রাখবে না কাউকে।'

মেশিনের মত হাত চালাল তিন গোয়েন্দা। লম্বা, নরম হোস পাইপ দিয়ে আচ্ছামত পেঁচিয়ে বাঁধল মুরগি-ছিলাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে একটু পর স্থির হয়ে গেল সে। বুঝতে পেরেছে আর মোড়ামুড়ি করে লাভ নেই।

'এখন কী?' রবিন বলল।

'এখানেই পড়ে থাক,' কিশোর বলল। 'পুলিশে খবর দিই গিয়ে। ওঁরা এসে যা করার করবেন।'

'এতক্ষণে শ্যারন হয়তো ব্যাপারটা জানিয়েছে ওঁদেরকে,' মুসা বলল।

'তবু চলো,' বলল রবিন। 'আমরাও যাই।'

'তা বোধহয় ঠিক হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমরা কেউ না

থাকলে কোনওমতে পালিয়ে যেতে পারে। আমাদের ওপরও প্রতিশোধ নেবে সুযোগ বুঝে।'

তা ঠিক, মনে মনে সায় দিল রবিন ও মুসা।

এ মুহূর্তে যতই নিস্তেজ আর অসহায় মনে হোক না কেন, আসলে তো লোকটা ভয়ঙ্কর। সুযোগ পেলে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে যে-কোনও মুহূর্তে।

ভাল করে লোকটার মুখের দিকে চাইল কিশোর। কোথায় পচন ধরেছে? অবাক হয়ে ভাবল। আগের মতই তো আছে মুরগি-ছিলা। তখন কি ভুল দেখেছিল ওরা? তাই হবে। ভুলই দেখেছে।

'এক কাজ করা যাক তা হলে,' কিশোর বলল। 'একে আমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো। দেখি রাশেদ চাচার কাছ থেকে কোনও পরামর্শ পাওয়া যায় কি না।'

'তাই করি চলো,' উৎসাহিত হয়ে উঠল মুসা। কিন্তু পরক্ষণে চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মত। 'কিন্তু এতবড় একটা দানবকে অতদূর নেয়া যাবে কী করে?'

কয়েক মুহূর্ত ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল কিশোর। তারপর বলল, 'ইউরেকা! পেয়েছি উপায়!'

'কী?' রবিন প্রশ্ন করল।

বাগানের একপ্রান্তে রাখা খুদে ট্রাকটরের মত নীল রঙের একটা যন্ত্র দেখাল কিশোর। 'ওই যে!'

ঘুরে চাইল ওরা। ওটা একটা বড়সড় ঘাস কাটার মেশিন।

'আমরা এদিকের পুলিশের কাছে একে দেব না,' বলল কিশোর। 'তুলে দেব রকি বিচ পুলিশের হাতে!'

চোদ্দ

ট্রাকটর মোয়ার ওটা। ইগনিশন-এ চাবিও আছে।

ঘাস কাটা ও চাষ করার যন্ত্র। ওটার পিছনে যুক্ত আছে বড় এক

ট্র্যাশ কার্ট। অ্যালুমিনিয়ামের।

ঝিম মেরে পড়ে থাকা মুরগি-ছিলা হেক্টরের কাছে যন্ত্রটা নিয়ে এল কিশোর। তিনবন্ধু মিলে লোকটাকে কার্টে তোলার সংগ্রামে লাগল। এবারও সেই একই সমস্যা দেখা দিল।

ভীষণ ওজন মুরগি-ছিলার। কোনওমতেই সুবিধে করে উঠতে পারছে না ওরা। অবশ্য এক সময় সফল হলো। গমের বস্তার মত গোল হয়ে পড়ে থাকা দেহটা কার্টে তুলে হাঁপাতে লাগল।

'বাপরে!' একটু সামলে নিয়ে বলল মুসা। 'কী ওজন! খাইছে! খোদাই ষাঁড়, এটা কি মানুষ? না আর কিছু?'

কিশোর উঠে বসল যন্ত্রের ড্রাইভিং সীটে। ওরা দু'জন বসল ঘাস কাটার ব্লেডের উপরের ধাতব ঢাকনির উপর।

যন্ত্র চালুর আগে চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলো কিশোর। 'যাক বাবা,' বলল। 'কোনও সমস্যা হবে না, শুধু লিভার সামনে ঠেলে দিলেই চলতে শুরু করবে।'

ইঞ্জিন চালু করতেই স্টিয়ারিং হুইল ধরে লিভার ঠেলল। গুঞ্জন তুলে এগোতে শুরু করল ট্রাকটর মোয়ার।

ঘাস কাটার ব্লেড ঘুরতে শুরু করায় একটু একটু কাঁপছে।

ঢাকনার নীচে ধারাল ব্লেড ঘুরছে টের পেয়ে নিজেদের পিছন দিকের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠল রবিন ও মুসা।

'খাইছে!' লাফিয়ে নেমে যাওয়ার অবস্থা করল মুসা। 'ব্লেড অফ করো!'

ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলল কিশোর। সুইচটা খুঁজে পেয়ে অফ করে দিল। 'দুঃখিত। মনে ছিল না।'

'ঠিকমত অফ করেছ তো?' সন্দেহ প্রকাশ করল মুসা। 'আবার চলতে শুরু করবে না তো?'

'না, করবে না। বসে থাকো চুপ করে।'

ইঁট বিছানো রাস্তা ধরে নাচতে নাচতে চলল ট্রাকটর। তারপর কিছুটা ভেজা মাটির উপর দিয়ে চলে বাড়ির সামনের রাস্তায় এসে উঠল।

সেখান থেকে গেট পেরোলেই পাকা রাস্তা।

'দারুণ গাড়ি আমাদের!' রবিন মন্তব্য করল। 'মজা লাগছে।'

'আমারও,' মুসা বলল।

কিশোর স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে ট্রাকটর নিজেদের বাড়িমুখো করল। ভাবছে, আপদটাকে একবার ওই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে হয়। তারপর আর ভাবতে হবে না।

মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে।

এখন খুব ভাল লাগছে।

এত ভাল আগে কখনও লেগেছে কি না, মনে করতে পারল না।

'এই লোকটা যদি সঙ্গে না থাকত,' রবিন বলল। 'তা হলে সময়টা খুব উপভোগ্য হত।'

ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে ট্রাকটর।

পথের দু'পাশের সব বাড়িঘর আঁধারে ডুবে আছে।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষ।

'কী আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে সবাই,' বলল মুসা। 'কারও কোনও ধারণা নেই কী বিপদে পড়েছিলাম আমরা।'

বৃষ্টি প্রায় থেমেই গেছে।

বাতাস বইছে মৃদু।

ওদের গায়ে লেপ্টে থাকা শার্ট-প্যান্ট সপসপ করছে। গায়ের গরমে একটু একটু করে শুকাতে শুরু করেছে।

'মনে হচ্ছে আজকের রাতটা আমরা অন্য কোনও পৃথিবীতে কাটিয়ে এসেছি,' মুসা বলল। 'যেখানে মা নেই, বাবা নেই, ভাইবোন নেই, কেউ নেই।'

'টিচারও নেই,' রবিন যোগ করল।

হেসে ফেলল কিশোর। 'চোপ, ফাঁকিবাজ, বলবার মত কোনও স্যর নেই! নিজেদের পুলিশ পুলিশ মনে হচ্ছে না তোমাদের?'

'তা হচ্ছে,' রবিন বলল।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে এগোল ওরা।

শীতে একটু একটু কাঁপছে।

কথাটা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেই বসল মুসা।

'আরেকটু জোরে চালানো যায় না গাড়িটাকে? বেশ শীত করছে।'

'চালাতে তো চাই,' কিশোর বলল। 'কিন্তু চলছে না। গতি বেশি না এটার।'

মসৃণ রাস্তায় এগিয়ে চলল ট্রাক্টর।

মাঝে মাঝে নিশাচর পাখির ডাক ভেসে আসছে।

দূরে কোথাও বাঁশি বাজাচ্ছে পাহারাদার।

কাছেই কোনও বাড়িতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় শিশু কাঁদছে। খিদে পেয়েছে বোধহয়।

রাস্তায় কোনও পুলিশ নেই, অবাক হয়ে ভাবল কিশোর। আবহাওয়া না হয় একটু খারাপ, তাই বলে ঘুমাবে সবাই?

হঠাৎ কী খেয়াল হতে পিছনে চাইল রবিন। পরক্ষণে আঁতকে উঠল কার্ট খালি দেখে।

মুরগি-ছিলা নেই!

কখন যেন বাঁধন কেটে নেমে পড়েছে ট্রাকটর থেকে!

পনেরো

ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল রবিনের।

শূন্য কার্টের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে সামনে হাত বাড়াল, কিশোরের কাঁধ আঁকড়ে ধরল।

কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু গলা বুজে এসেছে।

ব্যথা পেয়ে 'উফ্!' করে উঠল কিশোর। দ্রুত ঘুরে চাইল। 'কী ব্যাপার, রবিন?'

'লো-লোকটা নেই! মু-মুরগি-ছিলা...'

ঝট করে পিছনে চাইল মুসা। গলা দিয়ে অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল।

কিশোর থমকে গেছে।

ট্রাকটর দাঁড় করিয়ে ফেলল।

পিছনের আধো আলো আধো অন্ধকারে চেয়ে রইল সবাই।

'মুরগি-ছিলা হেক্টর নেই!' আবার বলে উঠল রবিন। এমন ভাবে, যেন ওর নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না।

কিশোর-মুসা পরস্পরের দিকে চাইল। চাউনিতে অবিশ্বাস আর আতঙ্ক ভর করেছে।

ছোট কার্টটা ট্রাকটরের সঙ্গে আগের মতই যুক্ত, শুধু নেই জাল আর হোস পাইপ দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা জিন্দালাশটা।

ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে পড়ল কিশোর। দাঁড়িয়ে থাকল।

রবিন-মুসাও এসে যোগ দিল ওর পাশে।

সবার মনে প্রশ্ন।

অজানা আশঙ্কা।

'মনে হয় বাঁধন কেটে পালিয়েছে,' রবিন মন্তব্য করল।

'খাইছে! এবার মেরেই ফেলবে আমাদের,' বলল মুসা। 'কিন্তু কী করে বাঁধন কাটল? এত শক্ত বাঁধন...'

'আমার মনে হয় কাটেনি,' কিশোর বলল। 'গাড়ির ঝাঁকিতে কোথাও পড়ে গেছে।'

'চল তা হলে,' রবিন বলল। 'ফিরে যাই। আবার ধরে নিয়ে আসতে...'

'দরকার নেই,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'মানে?' মুসা বলল।

'নতুন করে ঝামেলায় জড়ানোর কোনও দরকার নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'লোকটাকে ঠেকাতে আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব, আমরা তা করেছি। আসল ভয় ছিল শ্যারনকে নিয়ে, ও এখন নিরাপদ। মুরগি-ছিলার প্রতিশোধ নেয়ার মত আর কেউ নেই। কাজেই এখন আর নতুন করে তার পিছু নেয়ার কোনও দরকার নেই।'

'কিন্তু...' শেষ না করে থেমে গেল মুসা।

'কিন্তু কী?' কিশোর বলল।

'ওই লোক আমাদেরকে চিনে রেখেছে,' মুসা বলল। 'যদি

ভবিষ্যতে কোনওদিন প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে?'

'আমাদেরকে পাবে কোথায়?' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া সেরকম কিছু যদি করতে চায়, আজকের মত আরেকবার চরম শিক্ষা দেব ওকে।'

'তা হলে এবার কী?' মুসা বলল।

'বাড়ি ফিরতে হবে এখন। সন্ধে থেকে খোঁজ নেই আমাদের। কার বাড়িতে কী অবস্থা চলছে, কে জানে!'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'তা ঠিক। এত ঝামেলা যে হবে কে জানত?'

'একটা কাজ করা যাক,' কিশোর নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। 'বাড়ি যাওয়ার পথে একবার দেখে গেলে হয় লোকটা আসলেই পালিয়ে গেছে, না পড়ে গেছে। পড়ে গিয়ে থাকলে হয়তো এখনও পড়েই আছে।'

মাথা দোলাল মুসা। 'পড়ে থাকলে কী করবে?'

'থানায় গিয়ে জানিয়ে আসব। পুলিশ গিয়ে তুলে আনবে। নইলে ওই অবস্থায় মরেও যেতে পারে মুরগি-ছিলা হেক্টর।'

'মরুক না,' বলল মুসা। 'আমাদের কম জ্বালিয়েছে? একটা খুনি, সন্ত্রাসী। মরল না বাঁচল, আমাদের সে খোঁজে কী দরকার?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'কথাটা ঠিক নয়। খুনি হোক, সন্ত্রাসী হোক, তারপরও একটা পরিচয় আছে মুরগি-ছিলা হেক্টরের। তা হলো, সে-ও মানুষ। আমাদের মত হয়তো তারও পরিবার আছে, হয়তো বউ-বাচ্চাও আছে। বুড়ো মা-বাপ আছে। সকালে কাসলারের গুলিতে যদি তার মৃত্যু হত, আমাদের তাতে কিছু আসত যেত না।

'কিন্তু এখন যদি হাত-পা বাঁধা আবস্থায় অতিরিক্ত রক্ত-ক্ষরণে কোথাও পড়ে থেকে তার মৃত্যু হয়, সে জন্যে দায়ী হব আমরা। কারণ আমরাই বেঁধেছি ওকে। ছাড়া থাকলে ডাক্তারের সাহায্য নিতে পারত লোকটা।'

'ঠিক বলেছ,' রবিন বলল।

'কথাটা আমার মাথায় আসেনি। চলো, চলো,' তাড়া দিল মুসা।

ট্রাকটর ঘুরিয়ে ফেলল কিশোর। রবিন-মুসা উঠে বসল নিজেদের জায়গায়।

আবার চলতে শুরু করল যন্ত্রটা।

বেশিদূর যেতে হলো না।

এক-দেড় শ' গজ পিছাতেই মুরগি-ছিলা হেক্টরকে দেখতে পেল ওরা।

পথের পাশে পড়ে আছে বাঁধা অবস্থায়।

নিথর।

চোখ বোজা। মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে।

দেখলে যে কেউ বলবে মরে গেছে।

ষোলো

দেহটার দিকে চেয়ে রইল কিশোর-রবিন-মুসা।

শেষ পর্যন্ত হয়তো কিশোরের আশঙ্কাই সত্যি হলো।

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে তার?

হৃৎস্পন্দন নেই।

এবং এই মৃত্যুর জন্যে ওরা তিনজন কিছু না কিছু দায়ী।

চারদিক একটু একটু করে ফর্সা হয়ে উঠছে। ভোর হচ্ছে।

'থানায় ফোন করতে হবে,' কিশোর বলল। 'তা হলে পুলিশ এসে লাশটা মর্গে নিয়ে যাবে।'

'আবার সেই মর্গ?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'অপঘাতে মৃত্যু হলে লাশ মর্গে নিয়ে যেতেই হবে। এটাই আইন।'

'কিন্তু ফোন করতে হবে কেন?' মুসা বলল। 'দরকার কী? আমরা সরাসরি গেলেই তো পারি।'

'না। অতদূর যেতে ইচ্ছে করছে না। টেলিফোনেই জানাব, চলো।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক,' রবিন বলল। 'কাছেই তো

শ্যারনের চাচার বাড়ি। ওখান থেকেই ফোন করতে পারি আমরা।'

'তাই চলো,' কিশোর মাথা ঝাঁকাল।

ট্রাকটর যেখানে ছিল, সেখানে রেখে বাড়ির ভিতরে চলে এল ওরা তিনজন।

ড্রইং রুমে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে কিলনার বিচ থানায় ফোন করল কিশোর।

ও-প্রান্তের সাড়া পেতে অনেকক্ষণ লাগল। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ডিউটি অফিসার। ঘুম জড়ানো গলায় জবাব দিলেন, 'হ্যালো!'

'আমি কিলনার বিচ থেকে বলছি,' কিশোর বলল। 'এখানে পথের পাশে একটা লাশ...'

'লাশ? কোথায়... কোনখানে?' প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

কিশোর জায়গার বর্ণনা দিল, তারপর নতুন কোনও প্রশ্ন আসার আগেই রেখে দিল রিসিভার।

পনেরো মিনিট পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছল। সঙ্গে লাশ নেবার জন্যে ভ্যান আনা হয়েছে।

ততক্ষণে আরও ফর্সা হয়েছে চতুর্দিক।

পুলিশ দেখে একজন দু'জন করে কৌতূহলী দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগল মুরগি-ছিলা হেক্টরের লাশকে ঘিরে।

সুযোগ দেখে কিশোর-মুসা-রবিনও যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

কাছ থেকে দেখল মৃতদেহটা।

রক্ত নেই বলে একদম ফ্যাকাসে হয়ে আছে হেক্টরের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ।

সেই ভয়ঙ্কর লাল চোখদুটো বোজা।

গর্তে বসে গেছে।

দেহে দুটো গুলির ক্ষত।

একদম কাছ থেকে দেখে সবাই নিশ্চিত—সত্যিই মারা গেছে লোকটা।

দু'জন পুলিশ জাল ও পাইপের বাঁধন খুলে দিয়ে দেহটা ভ্যানে তুলছেন।

দর্শকদের একজন কাছে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মৃতদেহ।

'আরেহ্! এ তো মুরগি-ছিলা হেক্টর, তাই না?' সবিস্ময়ে বলল সে। 'এই তো কাল মারা গিয়েছিল। লাশ মর্গে ছিল। এখানে এল কী করে? আর শরীর তো এখনও গরম দেখছি!'

লাশ নিতে আসা দুই পুলিশ ভীষণ অবাক হলেন। ভাল করে মৃতের মুখটা দেখলেন তাঁরা, বোকার মত পরস্পরের মুখের দিকে চাইলেন। লোকটা সত্যিই বলেছে, এটা মুরগি-ছিলা হেক্টরই।

অথচ মাত্র বিশ ঘণ্টা আগে পুলিশ লাশটাকে পৌছে দিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

এ কী আজব কথা!

সে লাশ এখানে এল কী করে?

তা-ও এরকম আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কেন?

সমস্ত প্রশ্ন আর বিস্ময় তখনকার মত জমা রেখে লাশ ভ্যানে তোলার জন্যে প্রস্তুত হলেন পিক-আপ ভ্যান চালক ও দুই পুলিশ।

তিনজন মিলে উঁচু করে ভ্যানে শোয়ালেন দেহটা।

শেষ মুহূর্তে ভ্যান চালকের পিছনের সীটে বাড়ি খেল হেক্টরের মাথা।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল সে।

আবার বেঁচে উঠেছে মুরগি-ছিলা হেক্টর!

রক্তলাল চোখে এদিক-ওদিক চাইল হতভম্বের মত।

চমকে উঠে পিছিয়ে গেল সবাই।

অবিশ্বাস্য!

এ কী করে সম্ভব?

দ্রুত দূরে সরে গেল লোকজন। পুলিশও।

দ্রুত নিজেদেরকে সামলে নিলেন দুই পুলিশ।

এগিয়ে এসে বেঁধে ফেললেন তাকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সবাই।

সতেরো

'তা হলে তোমরা শুরু থেকে লেগে ছিলে মুরগি-ছিলা হেক্টরের পিছনে?' প্রশ্নটা করলেন কিলনার বিচ থানার সেকেণ্ড অফিসার রকি হ্যানসন। 'তোমরাই "লাশের" খবর দিয়েছিলে পুলিশ কন্ট্রোল রুম আর কমিশনারের বাড়িতে?'

'জ্বি,' কিশোর বলল।

সেদিন সন্ধের ঘটনা। পুলিশ অফিসারের রুমে তাঁর মুখোমুখি বসে আছে ওরা তিন গোয়েন্দা—কিশোর-মুসা-রবিন। হেক্টর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে এসেছে।

লোকটা বারবার মরে গিয়েও কীভাবে বেঁচে ওঠে, এর ভিতরের রহস্য কী, না জানা পর্যন্ত শান্তি হবে না ওদের।

'তা-ই বলো,' বললেন সেকেণ্ড অফিসার। কিছুক্ষণ ভাবলেন কী যেন। তারপর হেসে বললেন, 'তোমরা যে রহস্যের সমাধান খুঁজছ, আমি তা জানি। কিন্তু তার আগে কাল ঠিক কী ঘটেছিল, সব জানাও আমাকে। কাল কোর্টে পাঠাতে হবে লোকটাকে, রিপোর্ট লিখতে হবে। এতক্ষণ ভেবে পাচ্ছি না কী লিখব।'

'লোকটা তা হলে সত্যিই বেঁচে আছে?' বলল মুসা।

'হ্যাঁ,' বললেন সেকেণ্ড অফিসার। 'বহাল তবিয়তে আছে। অবশ্য দুটো গুলি খেয়ে একটু কাহিল এ মুহূর্তে। তবে ও কিছু নয়। চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, সেরে উঠবে।'

'তারপর নিশ্চয়ই জেল?' মুসা বলল।

'বলা যাচ্ছে না,' বললেন অফিসার। 'ও কাউকে খুন করেনি, তবে খুন করার চেষ্টা করেছে। এ জন্যে তার শাস্তি হতে পারে।'

এবার ওদের বিস্ময়ের পালা।

কিশোর বলল, 'কিন্তু আমি যে টেলিফোনে স্পষ্ট শুনতে পেলাম কমিশনার সাহেব চিৎকার করছেন।'

'সে তো ভয়ে!' হেসে ফেললেন অফিসার।

'হেক্টর তা হলে খুন...'

দ্রুত মাথা নাড়লেন সেকেণ্ড অফিসার। 'উঁহুঁ! মানুষ কেন, একটা কুকুর মারার মত শক্তি তার ছিল না। অ্যাটাক হবার পর জ্ঞান ফিরলে এক দিন খুব দুর্বল থাকে মুরগি-ছিলা হেক্টর।'

'অ্যাটাক!' কিশোর বলল। 'কীসের অ্যাটাক?'

'বলছি। তার আগে তুমি পুরো ঘটনাটা খুলে বলো।'

শুরু করল কিশোর। কাল বিকেলে হাসপাতালে ছোট খালাকে দেখতে যাওয়ার জন্যে মুসার প্রস্তাব থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা একে একে বলল। কাসলারের প্রসঙ্গ উঠতে ভুরু কুঁচকে উঠল অফিসারের। 'আচ্ছা!' বললেন তিনি। 'ওকেও তা হলে আক্রমণ করেছিল হেক্টর?'

'জ্বি। ও নাকি সকালে তাকে গুলি করেছিল।'

'হ্যাঁ। শুনেছি আমি। সে-ও মরেনি, বেঁচে আছে। বরং আরও একটা গুলি করেছে হেক্টরকে। যাকগে, তার পর?'

আবার শুরু করল কিশোর। সকালে থানায় ফোন করা পর্যন্ত একনাগাড়ে বলে থামল।

হাসতে শুরু করলেন অফিসার। 'তোমরা তা হলে ধরে নিয়েছিলে হেক্টর প্রেতাত্মা বা ওই ধরনের কিছু, কেমন?'

লজ্জা পেল মুসা। 'না, মানে... মৃত একজনকে হঠাৎ উঠে বসতে দেখে...'

হা-হা করে হেসে উঠলেন উনি। 'ভুল আসলে তোমাদের নয়। আমাদের কারও নয়, ভুলটা হয়েছে ভেতরের খবর জানা ছিল না বলে।'

'সেটা কী?' কিশোর বলল।

ওদেরকে পালা করে দেখলেন তিনি। 'মুরগি-ছিলা হেক্টর আসলে মরেনি, বেঁচেই ছিল।'

'তা কি করে হয়!' রবিন বলল।

'বলছি। লোকটার ঘাড়ের একটা বিশেষ নার্ভে ক্রটি আছে। ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনায় ক্রটির সৃষ্টি হয়। তখন থেকেই কখনও ওই

নার্ভে বড় ধরনের ঝাঁকি বা ধাক্কা খেলে সম্পূর্ণ অচল হয়ে যেত হেক্টর। যতক্ষণ না একই জায়গায় আরেকটা ধাক্কা লাগত, ততক্ষণ মৃতের মত পড়ে থাকত। বোঝাই যেত না বেঁচে আছে না মরে গেছে। সে সময় শ্বাস-প্রশ্বাসও প্রায় বন্ধ থাকত হেক্টরের। এবার এমন অবস্থা হলো, যে ডাক্তারও ধরতে পারেনি লোকটা জীবিত।'

'আচ্ছা!' বলল কিশোর।

রবিন ও মুসা হতভম্ব। কারও মুখে রা নেই।

এমন আজব ঘটনা জীবনে এই প্রথম শুনছে ওরা।

'অবশ্য সব সময়ই যে ধাক্কার প্রয়োজন হত, তাও নয়,' বললেন সেকেণ্ড অফিসার। 'কখনও কখনও এমনিতেই ঠিক হয়ে যেত। এখন বুঝতে পারছি কাল দু'বার এই ঘটনার শিকার হয়েছে মুরগি-ছিলা। প্রথমবার হয়েছে কমিশনার সাহেবের বাউণ্ডারি ওয়াল থেকে পড়ে গিয়ে, দ্বিতীয়বার তোমাদের ট্রাকটর থেকে পড়ে গিয়ে। প্রথমবার এমনি এমনি ঠিক হয়ে গিয়েছিল লোকটা, পরের ঘটনা তোমরাও দেখেছ। ভ্যানের সীটের সঙ্গে বাড়ি খেতেই ঠিক হয়ে যায় সে।'

পরস্পরের দিকে চাইল তিন বন্ধু।

'হেক্টরের এই ত্রুটির কথা কখন জেনেছেন আপনি?' কিশোর জানতে চাইল।

'আজই। ওর বাবা এসেছিল। সে বলেছে। লোকটা গ্রামের বাড়িতে ছিল। আজ শহরে ফিরে ছুটে এসেছে থানায়।'

লম্বা করে দম নিল কিশোর। 'তাও ভাল, জ্ঞান ফিরে এসেছিল মুরগি-ছিলা হেক্টরের। নইলে হাসপাতালের ডোম হয়তো জ্যান্ত মানুষ কেটেচিরে...'

'ঠিক বলেছ,' বললেন অফিসার। 'ভয়ঙ্কর এক বিপদ থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছি আমরা।'

কিশোর মনে মনে বলল, 'আমরাও!'

***

ড্রাগনরাজার দেশে

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

পূর্ব কথা

গরমের এক দিনে পেনসিলভেনিয়ার ফ্রগ ক্রীক বনভূমিতে রহস্যময় এক ট্রী হাউস উদয় হয়।

তিন গোয়েন্দা দড়ির মই বেয়ে ট্রী হাউসে ওঠে। ওরা আবিষ্কার করে ওটা বই দিয়ে ঠাসা।

ওরা শীঘ্রি জানতে পারে ট্রী হাউসটা জাদুর। বইয়ে উল্লেখিত নানান জায়গায় ওদেরকে নিয়ে যেতে পারে। ওদেরকে শুধু একটা ছবিতে আঙুল রেখে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়।

এক পর্যায়ে জানা যায় ট্রী হাউসটার মালিক মরগ্যান লে ফে। রাজা আর্থারের সময়কার এক জাদুকরী লাইব্রেরিয়ান সে। টাইম আর স্পেসে ভ্রমণ করে বই সংগ্রহের বাতিক তার।

তিন গোয়েন্দা আর জিনাকে মরগ্যান মাস্টার লাইব্রেরিয়ান করে দিয়েছে। ওদেরকে সে এম এল লেখা গোপন লাইব্রেরি কার্ড দিয়েছে।

মরগ্যান এবার ওদেরকে প্রাচীন চীন দেশে পাঠাচ্ছে...

এক

কিশোরের কামরায় উঁকি দিল জিনা।

'চীনে যাওয়ার জন্যে রেডি?' প্রশ্ন করল।

গভীর শ্বাস টানল কিশোর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল।

'সিক্রেট লাইব্রেরি কার্ডটা নিয়ে নিয়ো,' বলল জিনা। 'আমারটা আমার পকেটে আছে।'

'হুঁ,' বলল কিশোর।

টপ ড্রেসার ড্রয়ার খুলে কাঠের তৈরি পাতলা এক কার্ড তুলে নিল। আলোয় চকমক করে উঠল এম এল অক্ষর দুটো। ব্যাকপ্যাকে কার্ডটা রেখে দিল কিশোর। এবার নোটবই আর পেন্সিল ছুঁড়ে দিল ভিতরে।

'চলো যাই,' বলল জিনা।

কিশোর প্যাকটা পিঠে চাপিয়ে অনুসরণ করল ওকে।

আজকে কপালে কী আছে কে জানে, বলল মনে মনে।

'আসি, আন্টি!' বলল জিনা । মেরি পাশা রান্নাঘরে ছিলেন।

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' মেরি পাশা প্রশ্ন করলেন।

'চীনে!' জানাল জিনা।

'খুব ভাল,' বললেন মেরি পাশা। চোখ টিপলেন ওদের উদ্দেশে। 'মজা করোগে যাও।'

মজা? ভাবল কিশোর, ওর মনে হলো 'মজা' সঠিক শব্দ না।

'চাচী, দোয়া কোরো যেন ভাগ্য আমাদের পক্ষে থাকে,' বলল ও। এবার জিনাকে নিয়ে বেরিয়ে এল সদর দরজা দিয়ে।

'গুড লাক!' চেঁচিয়ে বললেন মেরি চাচী।

'চাচীর ধারণা আমরা ভান করছি,' কিশোর ফিসফিস করে বলল জিনাকে।

'হ্যাঁ,' বলে হাসল জিনা।

বাইরে ঝলমলে রোদ। পাখিরা গাইছে। ঝিঁঝি ডাকছে। কিশোর

আর জিনা রাস্তা ধরে ফ্রগ ক্রীক বনভূমির উদ্দেশে পা বাড়াল।

'চীনদেশে আবহাওয়া এত ভাল থাকবে কিনা কে জানে,' বলল জিনা।

'হুঁ, মরগ্যান কিন্তু বলেছে এবারের অভিযানটা বেশ বিপজ্জনক,' বলল কিশোর।

'সব অভিযানই তো বিপজ্জনক,' বলল জিনা। 'কিন্তু কেউ না কেউ ঠিকই আমাদের সাহায্য করে।'

'তা ঠিক,' বলল কিশোর।

'আমার মন বলছে আজকে মহান কোন মানুষের সাথে দেখা হবে,' বলল জিনা।

মৃদু হাসল কিশোর। ভয়ের বদলে রোমাঞ্চ অনুভব করছে ও।

'জলদি করো!' বলল জিনাকে।

ফ্রগ ক্রীক বনভূমিতে দৌড়ে ঢুকে পড়ল ওরা। লম্বা-লম্বা গাছ-পালার মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে বিশাল এক ওক গাছের কাছে এসে থামল।

'কেমন আছ!' পরিচিত এক কণ্ঠস্বর বলল।

মুখ তুলে চাইল ওরা। জাদুর ট্রী হাউস থেকে উঁকি দিচ্ছে মরগ্যান।

'পরের অভিযানের জন্যে তৈরি তোমরা?' প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ!' একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর জিনা।

দড়ির মইটা চেপে ধরে উঠতে শুরু করল।

'আমরা কি সত্যি সত্যি চীনে যাচ্ছি?' ট্রী হাউসে উঠে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'নিশ্চয়ই,' বলল মরগ্যান। 'তোমরা প্রাচীন চীনে যাচ্ছ। এই যে, যে গল্পটা তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে তার নাম।'

লম্বা, পাতলা এক টুকরো কাঠ তুলে ধরল মরগ্যান। জিনিসটা দেখতে অনেকটা স্কেলের মত, তবে সংখ্যার বদলে ওটায় অদ্ভুত সব লেখা দেখা গেল।

'বহু যুগ আগে, চীনেরা কাগজ বানাতে শেখে। ওটা ছিল দুনিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।' জানাল মরগ্যান। 'কিন্তু তোমরা তার

চাইতেও প্রাচীন আমলে যাচ্ছ, বই-পত্র যখন এরকম বাঁশের ফালিতে লেখা হত।'

'তারমানে এটা চীনে ভাষা?' বাঁশের লেখাগুলোর দিকে আঙুল তাক করে বলল জিনা।

'হ্যাঁ,' বলল মরগ্যান। 'আমাদের যেমন অক্ষর আছে, চীনেদের লেখায় তেমনি অনেক চিহ্ন রয়েছে। প্রতিটা চিহ্ন আলাদা জিনিস কিংবা ভাবনা বোঝায়। এই চিহ্নগুলো প্রাচীন এক চীনে কিংবদন্তীর শিরোনাম। রাজকীয় লাইব্রেরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগেই তোমাদেরকে কিংবদন্তীর সেই প্রথম লেখাটা খুঁজে বের করতে হবে।'

'জলদি চলো,' বলল জিনা।

'দাঁড়াও, রিসার্চ বইটা নেব না?' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ,' বলল মরগ্যান।

আলখিল্লার ভাঁজের ভিতর থেকে একটা বই বের করল। প্রচ্ছদে শিরোনাম লেখা: দ্য টাইম অভ দ্য ফার্স্ট এমপেরর।

কিশোরের হাতে বইটা তুলে দিল মরগ্যান।

'এই বইটা তোমাদের গাইড করবে,' বলল। 'কিন্তু মনে রেখো, চরম বিপদের সময় শুধুমাত্র প্রাচীন কিংবদন্তীটাই তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে।'

'কিন্তু আগে তো ওটা খুঁজে পেতে হবে,' বলল জিনা।

'হ্যাঁ,' বলল মরগ্যান।

কিশোরের হাতে বাঁশের ফালিটা তুলে দিল সে। ও ওটা প্যাকে ঢুকিয়ে রাখল।

কিশোর এবার গবেষণার বইটার প্রচ্ছদে আঙুল তাক করল।

'আমরা ওখানে যেতে চাই!' বলল।

বাতাস বইতে শুরু করল।

ট্রী হাউসটা ঘুরছে।

বন-বন করে ঘুরছে।

এবার সব কিছু স্থির।

একদম নিথর।

দুই

'বাহ, কাপড়গুলো কী নরম,' বলে উঠল জিনা। 'আর দেখো, লাইব্রেরি কার্ড রাখার জন্য পকেটও আছে।'

চোখ মেলল কিশোর। ওদের কাপড়-চোপড় জাদুবলে পাল্টে গেছে।

ওদের পরনে এখন আর জিন্স, টি-শার্ট, স্নিকার্স নেই। তার বদলে ওরা পরে রয়েছে ঢোলা প্যান্ট, ঢিলে শার্ট, খড়ের জুতো, আর গোল হ্যাট। জিনার শার্টে একটা পকেট আছে।

কিশোর লক্ষ করল ওর ব্যাকপ্যাকটা এখন অমসৃণ কাপড়ের এক থলেতে পরিণত হয়েছে। ভিতরে রয়েছে ওর গবেষণার বই, নোটবই, লাইব্রেরি কার্ড, আর বাঁশের ফালিটা।

'ওই দেখো, গরুর পাল,' বলল জিনা। জানালা দিয়ে বাইরে চাইল।

কিশোরও তাকাল। ট্রী হাউসটা রোদ ঝলমলে এক মাঠের নিঃসঙ্গ এক গাছে নেমেছে। গরুর পাল চরছে, আর এক তরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের উপর চোখ রাখছে। মাঠের এক প্রান্তে এক খামার বাড়ি। বাড়িটার ওপাশে এক দেয়ালঘেরা শহর।

'মনে হচ্ছে রাজ্যের শান্তি এখানে,' বলল জিনা।

'অত শিয়োর হয়ো না,' বলল কিশোর। 'মনে নেই অগ্ন্যুৎপাত ঘটার আগে পম্পেইকেও খুব শান্তির জায়গা মনে হচ্ছিল?'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল জিনা।

'দেখি বইতে কী বলে,' বলল কিশোর।

থলের ভিতরে হাত ভরে চীনে বইটা বের করল। ওটা খুলে জোরে জোরে পড়ল:

> প্রায় ২০০০ বছর আগে চীন
> শাসন করতেন দেশটির প্রথম সম্রাট।

যেহেতু তিনি ড্রাগনকে তাঁর প্রতীক
হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, সেহেতু
তাঁকে 'ড্রাগনরাজা' নামে ডাকা
হত। চীনে ড্রাগনকে সাহসী
আর শক্তিশালী জীব মনে করা হয়।

'ড্রাগনরাজা? শুনে কেমন ভয়-ভয় লাগছে,' বলল কিশোর।

'ওঁর পোশাকটা দেখো। কী দারুণ!' বলল জিনা।

লেখাটার পাশে এক ছবি। চওড়া হাতাওয়ালা দামী, ঢোলা আলখিল্লা পরা এক লোক। মাথার উঁচু হ্যাটটা থেকে পুঁতি ঝুলছে।

কিশোর ওর নোটবই বের করে লিখল:

প্রথম সম্রাটের নাম ছিল ড্রাগনরাজা

'আমাদের যে বইটা দরকার সেটা মনে হয় ড্রাগনরাজার লাইব্রেরিতে রয়েছে,' বলল জিনা। 'ওঁর প্রাসাদটা মনে হয় ওই শহরে।'

মুখ তুলে চাইল কিশোর।

'ঠিক,' বলল। 'আর ওটা দিয়ে মনে হয় ওখানে যাওয়া যায়।' মাঠের ওপাশে এক মেটে পথের দিকে আঙুল তাক করল ও, পাথুরে শহরটার দিকে গিয়েছে যেটা।

'ঠিক বলেছ,' বলল জিনা।

ট্রী হাউস থেকে বেরিয়ে এসে দড়ির মই বেয়ে নামতে লাগল ও।

কিশোর চীনে বইটা আর নোটবইটা ছুঁড়ে দিল থলের ভিতরে। এবার ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে জিনাকে অনুসরণ করল।

মাটিতে নেমে, মাঠ ভেদ করে পা চালাল।

'দেখো, ওই লোকটা আমাদের দিকে হাত নাড়ছে,' বলল জিনা।

রাখাল তরুণটি চেঁচাচ্ছে আর হাত নাড়ছে। এবার ওদের উদ্দেশে দৌড় দিল।

'আরি, কী চায় ও?' কিশোর প্রশ্ন করল।

এক মুহূর্ত পরে, তরুণ ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। তরুণটি সুদর্শন। মায়াময় মুখের চেহারা।

'তোমরা আমার একটা উপকার করতে পারো?' প্রশ্ন করল। 'আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

'নিশ্চয়ই,' বলল জিনা।

'রেশম তাঁতীকে একটা খবর পৌঁছে দিয়ো। খামারবাড়িতে মেয়েটিকে দেখতে পাবে তোমরা,' বলল তরুণ। 'সন্ধেবেলায় তাকে আমার সাথে দেখা করতে বোলো।'

'ঠিক আছে, কোন অসুবিধে নেই,' বলল জিনা।

তরুণ মৃদু হাসল।

'ধন্যবাদ,' বলে চলে যেতে উদ্যত হলো।

'এক মিনিট–' বলল কিশোর। 'সম্রাটের লাইব্রেরিটা কোথায় বলতে পারেন?'

তরুণের মায়াভরা মুখের চেহারায় আতঙ্কের ছায়া খেলে গেল।

'কেন?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল।

'একটু দরকার ছিল আরকী,' জানাল কিশোর।

তরুণ মাথা নাড়ল।

'ড্রাগনরাজার কাছ থেকে সাবধান,' বলল সে। 'যা-ই করো না কেন, খুব সাবধান!'

এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে গেল গরুর পালের কাছে।

'একটা কথা বোঝা গেল,' নিচু স্বরে বলল কিশোর।

'কী?' জিনা জিজ্ঞেস করল।

'প্রথম দেখায় যতটা মনে হয়েছিল এটা ততটা শান্তির জায়গা নয়,' বলল কিশোর।

তিন

মাঠ পেরিয়ে রাস্তাটার দিকে এগোল ওরা। খামারবাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল জিনা।

'রেশম তাঁতীকে খুঁজে বের করে খবরটা দিতে হবে,' বলল ও।

'ফেরার পথে দেখা যাবে,' বলল কিশোর। 'সম্রাটের লাইব্রেরিটা খুঁজে পাব কিনা তাই ভাবছি আমি।'

'পরে যদি সময় না পাই?' বলল জিনা। 'আমরা কথা দিয়েছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।

'ঠিক আছে, মেয়েটাকেই আগে খুঁজে বের করি,' বলল কিশোর। 'আর মনে রেখো, মাথা নিচু করে রাখতে হবে, কেউ যাতে আমাদেরকে চিনতে না পারে।'

কিশোর আর জিনা মাথা নিচু করে বাড়িটার দিকে এগোল।

কাছাকাছি হতেই, হ্যাটের তলা থেকে উঁকি মারল কিশোর। খড় বোঝাই এক ঠেলা গাড়ি টানছে এক ষাঁড়। পুরুষরা মাটিতে নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করছে। মহিলারা তিন চাকার ঠেলা গাড়ি ভর্তি শস্য ঠেলে নিয়ে চলেছে।

'ওই যে!' বলে উঠল জিনা। খোলা এক বারান্দার উদ্দেশে তর্জনী নির্দেশ করল। এক তরুণী ওখানে বসে তাঁত বুনছে। 'এই মেয়েটাই হবে!'

তরুণীর কাছে ছুটে গেল জিনা। কিশোর চারধারে নজর বুলিয়ে দেখে নিল কেউ লক্ষ করছে কিনা। ভাগ্য ভাল, খামারকর্মীরা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। এদিকে কারও দৃষ্টি নেই। তবুও চারপাশে সতর্ক চাউনি বুলিয়ে বারান্দার দিকে হেঁটে গেল কিশোর।

জিনা ইতোমধ্যেই তরুণী তাঁতীর সঙ্গে কথা জুড়ে দিয়েছে।

'কী বলেছে ও?' প্রশ্ন করল তরুণী। ওর কণ্ঠস্বর মৃদু কিন্তু জোরাল। কালো চোখজোড়া সুখে জ্বলজ্বল করছে।

'বলেছে সন্ধেবেলায় মাঠে ওর সাথে দেখা করতে,' বলল জিনা। 'ছেলেটা যা সুন্দর দেখতে!'

'হ্যাঁ।' তরুণী লাজুক হাসল জিনার দিকে চেয়ে। এবার তাঁতের কাছে রাখা এক ঝুড়িতে হাত ভরে হলদে সুতোর এক বল তুলে নিল।

'সাহস করে খবরটা নিয়ে এসেছ,' বলল তরুণী, 'সেজন্যে আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার।'

রেশমের সুতোর বলটা জিনার হাতে দিল।

'বাহ, কী সুন্দর!' সপ্রশংস কণ্ঠে বলে উঠল জিনা। 'ধরে দেখো,' কিশোরের হাতে দিল ওটা। সুতোটা মসৃণ আর নরম।

'আপনি কীভাবে রেশম বানান?' কিশোর জানতে চাইল।

'রেশম পোকার গুটি থেকে,' জানাল তরুণী।

'তাই? পোকা?' বলল কিশোর। 'কথাটা টুকে নিই।'

থলেতে হাত ভরে দিল ও।

'দোহাই লাগে!' বলল তরুণী। 'রেশম তৈরি চীনের সবচাইতে মূল্যবান গোমর। কেউ এই গোমর ফাঁস করলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। ড্রাগনরাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন।'

'ওহ,' বলে উঠল কিশোর। হতাশ।

থলের মধ্যে রেশমের বলটা রেখে দিল।

'তোমরা দেরি না করে চলে যাও,' তরুণী তাঁতী ফিসফিস করে বলল। 'তোমাদেরকে দেখে ফেলেছে।'

কাঁধের উপর দিয়ে চাইল কিশোর। এক লোক ওদের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে।

'চলো,' বলল ও।

'আসি!' বলল জিনা। 'দেখা কোরো কিন্তু!'

'করব,' জানাল তরুণী তাঁতী।

'এসো,' ডাকল কিশোর।

তরুণীর কাছ থেকে শশব্যস্তে সরে গেল ওরা।

'দাঁড়াও!' কেউ একজন গর্জে উঠল।

'দৌড় দাও!' বলল জিনা।

চার

খামারবাড়িটাকে পাক খেয়ে ছুটল ওরা। বাড়িটার পিছনে অনেকগুলো থলে ভর্তি শস্যদানা নিয়ে এক ষাঁড়ের গাড়ি। আশপাশে কাউকে দেখা গেল না।

পিছনে চিৎকারের শব্দ জোরাল হয়েছে।

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল কিশোর আর জিনা, তারপর মালগাড়িটার পিছনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। নিজেদেরকে ঢেকে দিল শস্যের থলেগুলোর আড়ালে।

চেঁচামেচির শব্দ কাছিয়ে এলে ধড়াস করে উঠল কিশোরের বুক। শ্বাস চেপে রাখল ও। অপেক্ষা করছে লোকগুলো কখন বিদায় হবে।

হঠাৎই সামনের দিকে ঝাঁকি খেয়ে এগোল মাল গাড়িটা। কেউ একজন রয়েছে চালকের আসনে!

থলেগুলোর উপর দিয়ে উঁকি মারল কিশোর আর জিনা। কিশোর চালকের পিঠ দেখতে পাচ্ছে। মেটে রাস্তা ধরে নিশ্চিন্তে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলেছে সে। ওরা চলেছে দেয়ালঘেরা শহরটার উদ্দেশে!

আবারও মাথা নোয়াল কিশোর আর জিনা।

'ভাল হয়েছে!' ফিসফিস করে বলল জিনা। 'শহরে পৌঁছে টুক করে নেমে পড়লেই হলো।'

'হুঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তারপর সম্রাটের লাইব্রেরিটা খুঁজে বের করে, বইটা নিয়ে সোজা ট্রী হাউসে ফিরে যাওয়া।'

'নো প্রবলেম,' ফিসফিসিয়ে বলল জিনা।

'হোয়া!' মালগাড়িটা ধীরে ধীরে থেমে দাঁড়াল।

শ্বাস চেপে রেখেছে কিশোর। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর আর ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। ওরা দু'জন উঁকি মারল।

'হায় খোদা,' ফিসফিস করে বলে উঠল কিশোর।

মালগাড়ির সামনে লম্বা এক সার লোক রাস্তা পেরোচ্ছে। তাদের হাতে কুঠার, বেলচা আর নিড়ানি। পাহারাদাররা তাদের পাশে পাশে গটগট করে হাঁটছে।

'দেখি তো ব্যাপারটা কী,' বলল কিশোর।

থলের ভিতরে হাত ভরে চীনে বইটা বের করল। খুঁজে বের করল শ্রমিকদের ছবি। পড়ল ও:

ড্রাগনরাজা তাঁর প্রজাদের বাধ্য
করেন এক দেয়াল তৈরি করতে, চীন
যাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে
রক্ষা পায়। পরে অন্যান্য
সম্রাটরা দেয়ালটিকে আরও দীর্ঘ
করেন। শেষমেশ চীনের সীমান্তে
দেয়ালটি ৩৭০০ মাইল বিস্তৃতি পায়।
চীনের মহাপ্রাচীর এ যাবৎকালের সবচাইতে
দীর্ঘ স্থাপনা।

'ওহ, চীনের প্রাচীর,' বলে উঠল কিশোর। 'এই লোকগুলো প্রাচীরের কাজ করতে যাচ্ছে।'

ঠিক এসময় কেউ একজন চেপে ধরল কিশোর আর জিনাকে। মুখ তুলে চাইল ওরা। মাল গাড়ির চালক।

'তোমরা কারা?' ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল।

'আমরা—আহ—' কিশোর ভেবে পেল না কী বলবে।

কিশোরের হাতে ধরা খোলা বইটার দিকে দৃষ্টি পড়ল লোকটির। হাঁ হয়ে গেল মুখ। ছেড়ে দিল কিশোর আর জিনাকে। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে বইটা স্পর্শ করল। বিস্ফারিত চোখে আবারও চাইল ওদের দিকে।

'কী এটা?' প্রশ্ন করল।

পাঁচ

'আমাদের দেশের বই,' বলল কিশোর। 'আপনাদের বই বাঁশের তৈরি, কিন্তু আমাদেরগুলো কাগজের। আসলে আপনাদের দেশেই কাগজ আবিষ্কৃত হয়। তবে তা আরও পরে, ভবিষ্যতে।'

লোকটিকে বিভ্রান্ত দেখাল।

'বাদ দিন,' বলল জিনা। 'এটা পড়ার জন্যে। এটা থেকে অনেক

দূর-দূরান্তের খবর জানা যায়।'

লোকটি স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওদের দিকে। চোখ ভরে উঠেছে পানিতে।

'কী হলো?' নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করল জিনা।

'আমি পড়ালেখা করতে ভালবাসি,' বলল লোকটি।

'আমিও,' জানাল কিশোর।

মৃদু হাসল লোকটি।

'তোমরা বুঝতে পারনি! আমি চাষীর পোশাক পরে আছি,' বলল সে। 'কিন্তু আমি আসলে একজন বুদ্ধিজীবী। চীনদেশে বহুকাল যাবৎ আমরা সবচাইতে সম্মানিত মানুষ ছিলাম।'

ম্লান হয়ে গেল লোকটির হাসি। 'কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের এখন দুর্দিন,' বললেন তিনি। 'আমাদের অনেকে গা ঢাকা দিয়েছেন।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ড্রাগনরাজা জ্ঞানচর্চাকে ভয় পায়,' বললেন বুদ্ধিজীবী। 'সে চায় সে যা চাইবে মানুষ তা-ই ভাবুক। যে কোনদিন রাজা সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিতে পারে!'

সভয়ে ঢোক গিলল জিনা।

'তারমানে কি আমি যা ভাবছি তাই-ই?' বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন বুদ্ধিজীবী।

'সম্রাটের লাইব্রেরির সব বই পুড়িয়ে ফেলা হবে,' বললেন তিনি।

'কী জঘন্য ব্যাপার!' বলল জিনা।

'হ্যাঁ,' সায় জানালেন বুদ্ধিজীবী।

'ওই লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিয়ে যেতে এসেছি আমরা,' বলল কিশোর।

'তোমরা কারা?' বুদ্ধিজীবীর প্রশ্ন।

'ওঁকে দেখাও,' বলল জিনা।

শার্টের পকেটে হাত ঢুকাল ও আর কিশোর হাত ভরে দিল থলের ভিতরে। গোপন লাইব্রেরি কার্ড দুটো বের করল ওরা। অক্ষরগুলো রোদ পড়ে ঝিকোচ্ছে।

বুদ্ধিজীবীর চোয়াল আবারও ঝুলে পড়ল।

'আরি, তোমরা মাস্টার লাইব্রেরিয়ান,' বললেন তিনি। 'এত অল্পবয়সী সম্মানী মানুষের সাথে আগে আমার পরিচয় হয়নি।'

মাথা নুইয়ে সম্মান জানালেন তিনি।

'ধন্যবাদ,' জানাল কিশোর আর জিনা।

ওরাও পাল্টা মাথা নোয়াল।

'আমি তোমাদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' বুদ্ধিজীবী জানতে চাইলেন।

'রাজার লাইব্রেরিতে গিয়ে আমাদের এই বইটা খুঁজে বের করতে হবে,' বলল কিশোর।

মরূদ্যানের বাঁশের ফালিটা বুদ্ধিজীবীর দিকে বাড়িয়ে ধরল ও।

'আমরা রাজার লাইব্রেরিতে যাব,' বললেন বুদ্ধিজীবী। 'গল্পটা আমার ভাল মত জানা আছে। ওটা সত্যি ঘটনা, বহু আগে লেখা। কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমাদের ভীষণ বিপদ হবে।'

'তা আমরা জানি!' বলল জিনা।

বুদ্ধিজীবী স্মিত হাসলেন।

'পছন্দ করি এমন কাজ আবারও করতে পেরে ভাল লাগছে,' বললেন তিনি। 'চলো যাওয়া যাক।'

মাল গাড়ির সামনে চড়ে বসল সবাই। দূরে দেয়াল নির্মাতারা লম্বা সারিতে গটগট করে হেঁটে যাচ্ছে।

ষাঁড় দুটো চলতে শুরু করতেই কিশোর আর জিনার দিকে ঘুরে চাইলেন বুদ্ধিজীবী।

'তোমরা কোথা থেকে এসেছ?' প্রশ্ন করলেন।

'ফ্রগ ক্রীক, পেনসিলভেনিয়া,' জানাল জিনা।

'নাম শুনিনি,' বললেন বুদ্ধিজীবী। 'ওখানে লাইব্রেরি আছে?'

'হ্যাঁ, প্রতিটা শহরেই লাইব্রেরি আছে,' বলল কিশোর। 'আমাদের দেশে মনে হয় কয়েক হাজার লাইব্রেরি।'

'আর লাখ লাখ বই,' বলল জিনা। 'কেউ সেগুলো পোড়ায় না।'

'হ্যাঁ, লোকে লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করে,' জানাল কিশোর। বুদ্ধিজীবী ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে মাথা নাড়লেন।

'মনে হচ্ছে স্বর্গ,' বললেন।

ছয়

পরিখার উপর কাঠের এক সেতু। সেটার উপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে পার হলো মাল গাড়িটা। এবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের দরজার পাশে দাঁড়ানো প্রহরীদের পাশ কাটাল। 'দরজাগুলো কি সব সময়ই বন্ধ থাকে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'হ্যাঁ, রোজ সূর্যাস্তের সময়,' বললেন বুদ্ধিজীবী। 'ঘণ্টা বাজলে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তুলে নেয়া হয় সেতু। রাতের জন্যে বন্ধ হয়ে যায় শহর।'

'অতিথিদের তার আগেই মনে হয় বেরিয়ে যেতে হয়,' বলল জিনা। 'নইলে সারা রাতের জন্যে এখানে আটকা পড়ে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন বুদ্ধিজীবী।

শহরের দরজার মধ্য দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে ঢুকে পড়ল ওদের মালগাড়ি।

রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট বাড়ি-ঘরের গুচ্ছ। কাদার তৈরি ঘরগুলোর ছাদ খড়ে ছাওয়া। লোকজন বাইরে আগুন জ্বেলে রান্না-বান্না করছে। কাপড় ধুচ্ছে কাঠের গামলায়।

মালগাড়ি দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে, এসময় বাড়িগুলোর আকার বড় হলো। এগুলো রঙ করা কাঠ আর মাটির টালি দিয়ে তৈরি। প্রত্যেকটার ছাদ বাঁকা।

'ছাদগুলো এরকম কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'খারাপ আত্মাদের দূরে রাখার জন্য,' বললেন বুদ্ধিজীবী।

'সেটা কীরকম?' জিনার জিজ্ঞাসা।

'আত্মারা শুধুমাত্র সোজাসুজি চলাচল করতে পারে,' জানালেন বুদ্ধিজীবী।

'ও, আচ্ছা,' ফিসফিস করে বলল জিনা।

কয়েকটা চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে গেল মালগাড়িটা। এরপর বিশাল এক বাজার পেরোল। অজস্র দোকান আর মানুষ-জন দেখা গেল সেখানে। লোক-জন বাজারে মাছ, মুরগি, লাকড়ি, মালগাড়ির চাকা, রেশমী কাপড়, পশম এবং সবুজরঙা গয়না কেনা-বেচা করছে।

ছোট ছোট খাঁচা নিয়ে এক দোকান। তার সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেকে।

'ওখানে কী বিক্রি হচ্ছে?' জিনা জবাব চাইল।

'ঝিঁঝি পোকা,' বললেন বুদ্ধিজীবী। 'ভাল পোষ মানে। ওদেরকে চা পাতা খাওয়ালে সুন্দর গান শোনা যায়।'

মালগাড়িটা ড্রাগনরাজার দেয়ালঘেরা প্রাসাদের দিকে গড়িয়ে চলল। প্রাসাদের দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল ওরা।

'শস্য নিয়ে যান!' মিনারের প্রহরীর উদ্দেশে গলা ছেড়ে বললেন বুদ্ধিজীবী।

প্রহরী ভিতরে ঢুকতে ইশারা করল। ভিতরে অপূর্ব সব বাগান আর ইঁটের নিচু এক দেয়ালের ঘেরে মাটির বিশাল বিশাল স্তূপ।

'ওটা রাজকীয় কবরস্থান,' স্তূপের দিকে তর্জনী তাক করে বললেন বুদ্ধিজীবী। 'ওখানে ড্রাগনরাজার পূর্বপুরুষদের কবর দেয়া হয়েছে।'

'ড্রাগনরাজাকেও একদিন ওখানে কবর দেয়া হবে!' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ। তিন লাখ শ্রমিক তার সমাধিমন্দির বানাচ্ছে,' জানালেন বুদ্ধিজীবী।

'বাপ রে,' বলে উঠল জিনা।

কিশোর কাঁধের উপর দিয়ে কবরস্থানের উদ্দেশে চাইল। সমাধিমন্দির বানাতে এত শ্রমিক লাগে কেন ভাবছে ও।

'না!' হঠাৎই বলে উঠলেন বুদ্ধিজীবী।

পাঁই করে ঘুরল কিশোর।

'কী হলো?' প্রশ্ন করল।

প্রাসাদের উঠনের দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন বুদ্ধিজীবী। আকাশে কালো ধোঁয়ার মেঘ পাকিয়ে উঠছে।

'আগুন,' বললেন বুদ্ধিজীবী।

'বই পুড়াচ্ছে!' বলল কিশোর।

'জলদি!' বলল জিনা।

লাগাম টানলেন বুদ্ধিজীবী। পাথুরে পথটা ধরে দুলকি চালে এগোতে লাগল ষাঁড় দুটো। মালগাড়ি চত্বরে ঢোকার পর দেখা গেল চারদিকে সৈন্য গিজগিজ করছে।

কেউ কেউ প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ডে কাঠ ছুঁড়ে মারছে। অন্যরা প্রাসাদের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, হাতে বাঁশের ফালি।

'ওগুলো কি বই?' কিশোরের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। ফালিগুলো আলাদা আলাদা বাণ্ডিলে একসাথে বেঁধে রাখা হয়েছে,' গুঙিয়ে উঠলেন বুদ্ধিজীবী। 'প্রতিটা বাণ্ডিলই একটা করে বই।'

'দেখো!' বলল জিনা, প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের দিকে আঙুল তাক করল।

বাইরে বেরিয়ে এসেছে জমকালো আলখিল্লা আর উঁচু হ্যাট পরা এক লোক। কিশোর মুহূর্তে চিনে ফেলল তাকে—ড্রাগনরাজা!

সাত

আকাশের দিকে উঠে যাওয়া আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চেয়ে রয়েছেন ড্রাগনরাজা। আগুন ঘিরে বাতাস ভারী আর কম্পমান। বাঁশের বইগুলো অগ্নিকুণ্ডের পাশে গাদা করে রাখা, পোড়ানোর জন্য তৈরি।

'জলদি!' বলে উঠলেন বুদ্ধিজীবী।

মালগাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে জনতার ভিড়ে মিশে গেল ওরা।

ড্রাগনরাজা সৈনিকদের উদ্দেশে চেঁচালেন। তারা আগুনে বই ছুঁড়ে দিতে শুরু করল। পোড়ার সময় ফট-ফট শব্দ করতে লাগল বাঁশ।

'থামুন!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

কিশোর চেপে ধরল ওকে।

'চুপ করো!'

জিনা ঝটকা দিয়ে সরে গেল।

'থামুন!' আবারও চেঁচাল। কিন্তু আগুনের গর্জনের শব্দে হারিয়ে গেল ওর কণ্ঠ।

'ওই যে তোমাদের গল্পটা!' এসময় বললেন বুদ্ধিজীবী।

বাঁশের এক বইয়ের দিকে আঙুল নির্দেশ করলেন। গাদা থেকে পড়ে গেছে ওটা।

'আমি নিয়ে আসছি!' বলল জিনা।

বইটার কাছে দৌড়ে গেল ও।

'জিনা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

কিন্তু ইতোমধ্যেই জিনা বাঁশের ফালির বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে দৌড়ে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

'পেয়েছি! জলদি তোমার থলেতে ভরো!' বলল ও।

কিশোর বাঁশের ফালির বাণ্ডিলটা ঝটপট ঢুকিয়ে ফেলল থলের মধ্যে। এবার ভয়ার্ত চোখে চারধারে দৃষ্টি বুলাল। সভয়ে শ্বাস চাপল ও।

ড্রাগনরাজা অগ্নিঝরা চোখে ওদের দিকে চেয়ে! এবার তেড়ে এলেন এদিকে।

'পাকড়াও ওদেরকে!' ড্রাগনরাজা গর্জে উঠলেন।

'কবরস্থানের মধ্য দিয়ে দৌড় দাও!' কিশোর আর জিনার উদ্দেশে বললেন বুদ্ধিজীবী। 'সৈন্যরা পিছু নিতে ভয় পাবে। ওরা পূর্বপুরুষদের আত্মাদেরকে ভয় পায়!'

'ধন্যবাদ!' বলল কিশোর। 'সব কিছুর জন্যে ধন্যবাদ!'

'ভাল থাকবেন!' চেঁচাল জিনা।

এবার দৌড় দিল ও আর কিশোর। সৈন্যরা পিছনে চেঁচামেচি করছে। একটা তীর শিস কেটে গেল পাশ দিয়ে।

কিন্তু কিশোর আর জিনা দৌড় থামাল না। কবরস্থানের পথটা ধরে দৌড়ে চলল। ইঁটের নিচু দেয়ালটা লাফিয়ে পার হয়ে, মাটির বিশাল বিশাল স্তূপগুলোর মধ্য দিয়ে ছুটছে।

হঠাৎই চারপাশের বাতাস ভরে উঠল কাদের যেন ছোঁড়া তীরে। তীরন্দাজরা মিনার থেকে তীর ছুঁড়ছে!

'দেখো!' চেঁচাল কিশোর।

এক স্তূপের মধ্যে এক দরজা। কিশোর আর জিনা ভিতরে সেঁধিয়ে পড়ল।

লম্বা এক হল এটা। তেলের প্রদীপ জ্বলছে।

'কী চুপচাপ!' বলল জিনা। প্যাসেজওয়ে ধরে হেঁটে গেল। 'অ্যাই, এখানে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। নীচে নেমেছে।'

'আর এগিয়ো না!' বলল কিশোর।

'কেন?'

'নীচে কী আছে জানি না আমরা,' বলল কিশোর। 'এটা একটা সমাধিমন্দির, মনে নেই? জায়গাটা ভুতুড়ে।'

'একবার দেখব শুধু,' বলল জিনা। 'হয়তো বেরনোর পথ পেয়ে যাব।'

গভীর শ্বাস টানল কিশোর।

'হতে পারে,' বলল ও। 'ঠিক আছে, তাড়াহুড়ো কোরো না।' কোন মৃতদেহের গায়ে হোঁচট খেতে চায় না কিশোর।

খাড়া সিঁড়ির ধাপগুলো ভেঙে নামতে লাগল জিনা। ওকে অনুসরণ করল কিশোর। নীচে নেমে চলেছে, পথ দেখাচ্ছে প্রদীপের আলো। শেষমেশ তলদেশে পৌঁছতে পারল ওরা।

চোখ পিটপিট করল কিশোর। চারদিকে তেলের প্রদীপ জ্বলছে যদিও, চোখে আঁধার সয়ে আসতে খানিকক্ষণ সময় লাগল।

কিশোরের চোখ অদ্ভুত আলোয় অভ্যস্ত হতেই হৃৎপিণ্ড প্রায় বন্ধ

হওয়ার জোগাড় হলো।

'আরি,' শ্বাসের ফাঁকে বলল ও।

সৈন্য ভর্তি এক কামরায় ওরা—হাজার হাজার সৈন্য।

আট

কাঠ-পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর আর জিনা।

নীরব সৈন্যরাও একইভাবে দাঁড়িয়ে।

'এরা নকল,' শেষমেশ বলল কিশোর।

'নকল?' ফিসফিস করে বলল জিনা।

'হ্যাঁ।'

সোজা প্রথম সারির সেনাদের উদ্দেশে হেঁটে গেল কিশোর।

জিনা শ্বাস চেপে রেখেছে।

কিশোর এক সৈনিকের নাক ধরে টানল।

'নকল!' বলল।

এবার এগিয়ে এল জিনা। সৈনিকটির রঙমাখা মুখ স্পর্শ করল। পাথরের মত শক্ত।

'অদ্ভুত তো,' বলল জিনা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এজায়গাটা জাদুঘরের মত,' বলল।

দু'সারি সৈনিকের মাঝ দিয়ে হেঁটে গেল জিনা।

'দাঁড়াও, দেখে নিই বইতে কী বলে,' বলল কিশোর।

থলেটা নামিয়ে রেখে চীনে বইটা বের করল। নিথর সৈন্যদের এক ছবি খুঁজে নিয়ে পড়ল জোরে জোরে:

ড্রাগনরাজা তাঁর সমাধিমন্দিরের

জন্য ৭,০০০ প্রমাণ আকারের
কাদার সৈনিক তৈরি করিয়েছিলেন।
কাদা সেঁকে রং করা হয়।
ড্রাগনরাজা মনে করতেন মৃত্যুর
পর কাদার সৈনিকরা তাঁকে
রক্ষা করবে।

'প্রাচীন মিশরের পিরামিডের মত,' বলল কিশোর। 'মনে নেই? রানীকে নৌকা আর আরও অনেক কিছুসহ কবর দেয়া হয়, পরের জীবনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।' চারধারে নজর বুলাল ও। 'জিনা?'

'আমি এখানে,' সাড়া দিল জিনা। আরেক সারির দূর প্রান্তে রয়েছে ও।

'এখানে এসো,' চিৎকার করে বলল কিশোর।

'না, তুমি এখানে এসো,' বলল জিনা। 'দেখে যাও, সবার চেহারা আলাদা।'

থলের মধ্যে বইটা ছুঁড়ে দিল কিশোর। এবার শশব্যস্তে সারিটার শেষ মাথার দিকে এগোল।

'দেখো,' বলল জিনা।

প্রদীপের কাঁপা-কাঁপা আলোয় এক সারি থেকে অন্য সারিতে সরে যেতে লাগল ওরা। প্রতিটা সৈন্যের নাক-চোখ-মুখ আলাদা।

'এজন্যেই এখানে এত লোকের কাজ করতে হয়েছে,' বলল কিশোর।

'ভীষণ খেটেছে লোকগুলো,' বলল জিনা।

'হুঁ,' সায় দিল কিশোর।

লাল আর কালো বর্ম পরা তীরন্দাজ আর সৈন্যরা রয়েছে ওখানে।

সত্যিকারের তামার তরোয়াল, ছোরা, কুঠার, বর্শা আর তীর-ধনুকও দেখা গেল।

এমনকী ঘোড়া জুড়ে রাখা প্রমাণ আকারের কাঠের রথও দেখতে পেল কিশোর আর জিনা। ঘোড়াগুলোকে একদম জ্যান্ত মনে হলো। সাদা দাঁত আর লাল জিভ নিয়ে নানা রঙের ঘোড়া।

'একটু নোট নিয়ে নিই,' বলল কিশোর।

নোটবই আর পেন্সিল বের করল ও। এবার মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে লিখল:

সব মুখ আলাদা
এমনকী ঘোড়াদের মুখও

'কি-শোর,' ডাকল জিনা।

'কী?'

'আমার মনে হয় আমরা হারিয়ে গেছি,' বলল জিনা।

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'না, হারাইনি।'

'না হারালে বাইরে বেরোব কোন্ পথ দিয়ে?' বলল জিনা।

চারধারে দৃষ্টি বুলাল কিশোর। ও শুধু সারি সারি সৈন্য দেখতে পেল। সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁয়ে কিছু নেই−কেবলই কাদার সৈন্য।

'আমরা কোন্ দিক দিয়ে এসেছিলাম?' প্রশ্ন করল জিনা।

'জানি না,' বলল কিশোর।

সব কটা সারি দেখতে হুবহু এক। অসীম বিস্তার পেয়েছে যেন।

কিশোর সাহস হারাল না।

'একটু ঘুরেফিরে দেখি,' বলল।

'বাদ দাও,' বলল জিনা। 'মরগ্যান বলেছিল রিসার্চ বইটা আমাদের গাইড করবে। কিন্তু চরম বিপদের সময় শুধুমাত্র প্রাচীন কিংবদন্তীটাই আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে।'

'চরম বিপদ কি এসেছে?' বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল জিনা।

'হ্যাঁ।'

এখানে আঁধার যেন আরও গাঢ় হচ্ছে, ভাবল কিশোর। বাতাস ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এখন।

'সাহায্য চেয়ে দেখি,' বলল কিশোর।

থলেতে হাত ভরে বাঁশের বইটা বের করল ও। ওটা তুলে ধরে বলল, 'আমাদেরকে বাঁচাও!'

কিশোর অপেক্ষা করছে, সমাধিমন্দিরের নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠল।

কিশোর বইটা আবারও তুলে ধরল।

'আমাদেরকে বেরুনোর রাস্তা দেখিয়ে দাও,' বলল।

ও আর জিনা অপেক্ষা করছে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

বাতাস আরও ঘন হচ্ছে। আলো আরও ক্ষীণ হয়ে আসছে। সারি সারি সৈন্যদের দেখে গা ছমছমে ভাবটা আরও বাড়ছে।

সাহায্য এল না।

কিশোর অস্থির হয়ে উঠল।

'আমাদের—আমাদের মনে হয়—'

'দেখো!' বলে উঠল জিনা।

'কী?'

'সুতোর বল। তোমার থলে থেকে বেরিয়ে এসেছে!' বলল জিনা।

'তাতে কী?' কিশোরের জিজ্ঞাসা।

কাপড়ের থলেটার দিকে চাইল ও। মেঝেতে পড়ে রয়েছে ওটা। হলদে রেশমের বলটা গড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে। এখনও গড়াচ্ছে। পিছনে রেখে যাচ্ছে হলদে সুতোর ট্রেইল!

নয়

'কী হচ্ছে এসব?' কিশোর বলল।

'কে জানে,' বলল জিনা। 'কিন্তু আমাদের এটাকে ফলো করা উচিত।'

দ্রুত পায়ে রেশমী সুতোর বলটার পিছু নিল ও।

কিশোর বাঁশের বইটা থলেতে ঢুকিয়ে অনুসরণ করল ওকে।

সৈন্যদের একটি সারি পেরিয়ে আরেকটি সারির দিকে বাঁক নিয়েছে সুতো।

'এটা অসম্ভব!' বলে উঠল কিশোর। 'সায়েন্টিফিকালি অসম্ভব!'

'এটা তো জাদু!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

কিশোর ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু সুতোটাকে অনুসরণ করে চলল।

হঠাৎই সুতোর ট্রেইলটা উধাও হয়ে গেল। সব সুতো ফুরিয়ে গেছে।

কিশোর আর জিনা ঠায় দাঁড়িয়ে শ্বাস চেপে থাকল।

'এখন? এখন কী?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'ওই সিঁড়িগুলো দিয়ে ওঠা যাক,' বলল জিনা।

ম্লান আলো ভেদ করে কিশোর দেখতে পেল সামনে এক সার সিঁড়ি উঠে গেছে।

'চলো চলে যাই!' বলল ও।

সিঁড়ি ভেঙে এক দৌড়ে উঠে পড়ল ওরা। উপরে উঠে দেখতে পেল ওরা হল-এ রয়েছে, যেটি স্তূপের প্রবেশমুখের কাছে গিয়েছে।

প্রদীপের আলোয় আলোকিত প্যাসেজটা ধরে অবিরাম হেঁটে চলল ওরা। শেষমেশ থেমে দাঁড়াল কিশোর। 'এই হলটা তো এত লম্বা ছিল না,' বলল ও।

'হ্যাঁ,' বলল জিনা। 'আমরা মনে হয় অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলাম।'

'এখন কী করা?' বলল কিশোর।

'হাঁটতে থাকি,' জবাব দিল জিনা।

'হ্যাঁ, আর তো কিছু করারও নেই,' বলল কিশোর।

আবারও হাঁটা ধরল ওরা। কোনা ঘুরে এক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'বাহ, চমৎকার!' বলল জিনা।

'দাঁড়াও। ওপাশে কী আছে জানি না আমরা,' বলল কিশোর। 'আস্তে আস্তে যাও। সাবধানে।'

'ঠিক আছে।'

ধীরে ধীরে আর সতর্কতার সঙ্গে দরজাটা খুলল জিনা।

এবার উঁকি দিল।

'ইপ্পি,' মৃদু কণ্ঠে বলল।

দিনের ম্লান আলোয় পা রাখল জিনা। কিশোর এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

সূর্য ডুবে গেছে।

ড্রাগনরাজার প্রাসাদের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বাজারটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আজকের মত। 'বেঁচে গেছি!' বলল জিনা।

কিশোর স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

ঠিক এসময় একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। শহরের প্রাচীরের মিনার থেকে আসছে শব্দটা!

'হায় খোদা, ওরা গেট বন্ধ করে দিচ্ছে!' আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠল কিশোর।

দৌড় দিল ওরা। কিশোর থলেটা আঁকড়ে ধরেছে। রাস্তা ধরে ছুটছে দু'জনে। বাজারের পাশ কাটিয়ে দৌড়চ্ছে। দৌড়চ্ছে ধনী-গরীবদের বাসার পাশ দিয়ে।

ওদের খড়ের জুতো খসে পড়ল। কিন্তু খালি পায়েই ছুটে চলেছে কিশোর আর জিনা।

কাঠের বিশাল ফটক দুটো লেগে যাচ্ছে, এসময় ফাঁক গলে ছুটে বেরিয়ে গেল ওরা।

সেতু পেরোল দু'জনে। ছুটে চলল মেটে পথটা ধরে। খামারবাড়ি পেরিয়ে মাঠ ভেদ করে দৌড়চ্ছে।

গাছটার কাছে যখন পৌঁছেছে, কিশোরের ফুসফুস ফেটে যাওয়ার জোগাড়। বুক ধড়াস-ধড়াস করছে। পায়ের পাতা পুড়ে যাচ্ছে।

জিনার পিছু নিয়ে দড়ির মই বেয়ে উঠতে লাগল ও। ট্রী হাউসের ভিতরে ঢোকার পর এলিয়ে পড়ল কিশোর।

'এখন-বাড়ি-চলো,' কোনমতে আওড়াল।

পেনসিলভেনিয়ার বইটার দিকে হাত বাড়াল ও।

'দাঁড়াও,' বলল জিনা। জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। 'ওরা একজন আরেকজনকে খুঁজে পেয়েছে।'

'কে—কাকে—পেয়েছে?' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল কিশোর। নিজেকে জানালার কাছে টেনে নিয়ে এসে বাইরে তাকাল।

মাঠের কিনারে দুটো মানুষ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ।

'রেশম তাঁতী আর রাখাল!' বলল জিনা।

'ও, হ্যাঁ,' বলল কিশোর।

'বিদায়!' জিনা চিৎকার করল।

প্রেমিক যুগল ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

সন্তুষ্টির দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিনা।

'এখন যাওয়া যায়,' বলল।

কিশোর পেনসিলভেনিয়ার বইটা খুলে ফ্রগ ক্রীক বনভূমির ছবিতে আঙুল রাখল।

'আমরা ওখানে যেতে চাই,' বলল।

বাতাস বইতে শুরু করল।

চীনে যুগলের দিকে শেষবারের মত চাইল কিশোর। ওরা যেন নক্ষত্রের মতন জ্বলছে।

ট্রী হাউস ঘুরতে শুরু করল।

বন বন করে ঘুরছে।

এবার সব কিছু নিথর।

একদম স্থির।

দশ

চোখ মেলল কিশোর। ওর পরনে নিজের পোশাক আর স্নিকার্স। কাপড়ের থলেটা আবার ব্যাকপ্যাকে পরিণত হয়েছে।

'স্বাগতম, আমার মাস্টার লাইব্রেরিয়ানরা,' বলল মরগ্যান।

ট্রী হাউসে দাঁড়িয়ে সে, ওদের দিকে চেয়ে স্মিত হাসছে।

'হাই!' বলল জিনা।

'আমরা আপনার জন্যে প্রাচীন কিংবদন্তীটা নিয়ে এসেছি,' জানাল

কিশোর।

'সাবাস!' সোৎসাহে বলে উঠল মরগ্যান।

প্যাকে হাত ভরে দিল কিশোর। বের করে আনল চীনে বইটা। এবার টেনে বের করল বাঁশের বইটা। ওদুটো তুলে দিল মরগ্যানের হাতে।

'কিংবদন্তীটা কী নিয়ে?' প্রশ্ন করল জিনা।

'এটার নাম "রেশম তাঁতী আর রাখাল,"' বলল মরগ্যান। 'খুব নামকরা একটা চীনে গল্প।'

'ভাবতে পারেন আমরা ওদের দেখা পেয়েছিলাম! আমরা ওদেরকে মিলিত হতে সাহায্য করেছি!' বলে উঠল জিনা।

'ওহ্, তাই নাকি!' বলল মরগ্যান।

'হ্যাঁ!' জানাল কিশোর। 'রেশম তাঁতীর রেশমের গুটিটা আমাদের বাঁচিয়েছে!'

'কিংবদন্তীটাতে ওদের সম্পর্কে কী আছে?' প্রশ্ন করল জিনা।

'আছে, বহু আগে ওরা ছিল স্বর্গের মানুষ, যারা আকাশে বাস করত,' বলল মরগ্যান। 'পৃথিবীতে আসার পর ওরা একে অন্যের প্রেমে পড়ে।'

'আমরা যখন ওদের দেখা পাই!' বলল জিনা।

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা,' বলল মরগ্যান। 'তোমরা যে বইটা এনেছ তাতে পৃথিবীর বুকে ওদের সুখের কথা আছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, পরে আরেকটা কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, ওরা আকাশে ফিরে যাওয়ার পর, আকাশের রাজা-রানী ওদেরকে মিল্কি ওয়ে নামে এক স্বর্গীয় নদী দিয়ে আলাদা করে দেন।'

'ওহ্, না,' বলে উঠল জিনা।

'ওরা বছরে একবার মিলিত হয়,' বলল মরগ্যান। 'সে রাতে, পাখিরা আকাশে মিল্কি ওয়ের উপরে একটা সেতু বানিয়ে দেয়।'

কিশোর আর জিনা গ্রীষ্মের ঝলমলে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল।

'এখন বাড়ি যাও,' বলল মরগ্যান। 'দু'সপ্তাহ পর আবার এসো।

তোমাদেরকে তখন অন্যখানে পাঠাব।'

কিশোর ওর ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিল।

'আসি,' বলল জিনা। 'দু'সপ্তাহ পর দেখা হচ্ছে।'

'তোমাদের সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ,' বলল মরগ্যান।

'যখন বলবেন আমরা এক পায়ে খাড়া,' বলল জিনা।

দড়ির মইটা বেয়ে নেমে গেল ওরা। মাটিতে নেমে, মরগ্যানের উদ্দেশে হাত নাড়ল। এবার হিরু চাচার বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বনভূমির সীমানায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল জিনা।

'ঝিঁঝির ডাক শোনো,' বলল ও।

কান পাতল কিশোর। ঝিঁঝির ডাক অন্যান্য দিনের চাইতে জোরাল আজকে।

'ওদের পূর্বপুরুষরা ড্রাগনরাজার আমলে বাস করত,' বলল জিনা।

'হুঁ,' বলল কিশোর।

'এখন বড়রা ছোটদেরকে কিংবদন্তীর গল্প শোনাচ্ছে,' বলল জিনা।

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর।

'কিংবদন্তীটা ওদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে এসেছে,' জিনা বলল।

মৃদু হাসল কিশোর। ও স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু ঝিঁঝির ডাক শুনে মনে হচ্ছে গল্প দাদুর আসর জমেছে যেন। ঝিঁঝিরা যেন বলছে, ড্রাগনরাজা, ড্রাগনরাজা, ড্রাগনরাজা।

'কিশোর! জিনা!' এসময় একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

মেরি পাশা ডাকছেন।

জাদুমন্ত্রটা কেটে গেল। ঝিঁঝিদের গল্পটা এখন স্রেফ গুঞ্জনের মত শোনাচ্ছে।

'আসছি!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

কিশোর আর জিনা রাস্তা ধরে দৌড়ে উঠন পেরোল।

'চীনে কেমন কাটল তোদের?' চাচী প্রশ্ন করলেন।

'খুব ভয় পেয়েছিলাম,' জানাল জিনা।

'আমরা এক সমাধিমন্দিরে হারিয়ে গিয়েছিলাম,' বলল কিশোর।

'কিন্তু প্রাচীন এক বই আমাদের বাঁচিয়ে দেয়।'

মেরি পাশা মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালেন।

'বইয়ের কোন তুলনা হয় না, তাই না রে?' বললেন।

'হ্যাঁ!' একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর জিনা।

এবার চাচীর পিছন পিছন বাসার ভিতরে ঢুকে পড়ল।

***

এ-মাসের তিন গোয়েন্দা

কিশোর–রিফাত উল ইসলাম

এ ৪৩/১ জালেশ্বর, সোবাহানবাগ, সাভার
সাভার পৌরসভা, ঢাকা-১৩৪৩।

মুসা–তুশান

২ নং গলি, হিন্দুপাড়া, নজরুল কন্ট্রাক্টরের বাড়ি
উত্তর পতেঙ্গা, কাটগড়, চট্টগ্রাম-৪২০৪।

রবিন–তানভীরুল আনাম

ছায়াবিতান, ওয়ার্ড-৪, ব্লক বি, হোল্ডিং নং-৫১, কুমিল্লা।

জিনা–রোকসাত ইসলাম চৌধুরী

২৯/১ কাঠগোলা বাজার, ময়মনসিংহ।

এ-মাসের তিন গোয়েন্দা

রিফাত উল ইসলাম
কিশোর পাশা

তুশান
মুসা আমান

তানভীরুল আনাম
রবিন মিলফোর্ড

রোকসাত ইসলাম চৌধুরী
জিনা পারকার

তুমি কি 'তিন গোয়েন্দা' বা 'জিনা' হতে চাও?

তা হলে আজই সেবা প্রকাশনীর ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি পাঠাও। ছবির পিছনে নিজের পূর্ণ নাম-ঠিকানা লিখে দেবে। তোমার ছবি যে-বইয়ে ছাপা হবে, উপহার হিসাবে সেই বইয়ের ২টি কপি তোমার ঠিকানায় পাঠানো হবে। একজন একটির বেশি ছবি পাঠিয়ো না।

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারো।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবে। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবে না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবে। পাঠাবে আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবে: ঠিকানা অসম্পূর্ণ, স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবে না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মোঃ সামসুর রহমান (সাগর)
১৩/ডি, দক্ষিণ খিলগাও, উত্তর শাহজাহানপুর, ঝিলমসজিদ, ঢাকা।

শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় কাজী দা,

শুরুতেই দুটি শব্দ দিয়ে আপনাকে সম্ভাষণ জানালাম। কারণ আপনার ক্ষেত্রে এই দুটো কথাই খুব বেশি করে খাটে। আমি পঞ্চম শ্রেণী থেকেই তিন গোয়েন্দার অন্ধ ভক্ত পাঠক। সরি, অন্ধ নয়, অন্ধ হলে তো পড়তেই পারব না। আমি তিন গোয়েন্দার একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টিযুক্ত ভক্ত পাঠক। আপনার কাছে আমার একটি আবদার রয়েছে। আবদারটি হলো আমাদের সবার প্রিয় কিশোর-মুসা-রবিনকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তারা যেন আমাদের দেশে চলা সর্ব বৃহৎ রহস্য 'যুদ্ধাপরাধী বিচার' সমাধান করতে পারে। আমার বিশ্বাস তারা তা পারবে। সাথে যেন জিনা থাকে। রাফিয়ান তো তা হলে থাকবেই। আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, তিন গোয়েন্দারা এখন ট্রি হাউসে ওঠে না কেন? ট্রি হাউস কি মেরামত চলছে? হঠাৎ একটি দুটি গল্পে তারা ট্রি হাউসে চড়ছে। আপনাদের সবাইকে নতুন বইয়ের গন্ধের শুভেচ্ছা। বিশেষ করে রকিব ভাইকে। তিনি মনে হয় আমাদের উপর মাইণ্ড করেছেন। গল্প-টল্প বেশি লেখেন না তো তাই আর কী।

❋ ট্রি হাউস তো কবেই মেরামত হয়ে গেছে, কদিন অন্য রহস্য নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল ওরা... একটু অবসর পেলেই চড়ে বসবে। আর, যুদ্ধাপরাধীর বিচার আবার রহস্য হয় কী করে? যে ব্যাপারটা এ দেশের কোটি কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে, যার দাপটে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন ও নির্যাতিত হয়েছে, তার মধ্যে কোনও রহস্য নেই – ওটা স্রেফ অপরাধ। কোনও ধুয়া তুলে ওসব জায়েজ করা যাবে না। ...তোমার পাঠানো নতুন বইয়ের গন্ধের শুভেচ্ছা আমার খুব ভাল লাগল, খুশি মনে সবাই ভাগ করে নিলাম। তুমিও আমাদের শুভেচ্ছা নিয়ো।

রোকসাত ইসলাম চৌধুরী, প্র: রেজাউল ইসলাম, ২৯/১ ঢোলাদিয়া, কাঠগোলাবাজার, নদীর পাড়, জেলরোড, ময়মনসিংহ।

তিন গোয়েন্দার সবাইকে আমার সালাম ও প্রীতি শুভেচ্ছা। আমি তিন গোয়েন্দার একজন ভক্ত। রকিব আঙ্কেল ও শামসুদ্দীন নওয়াব আঙ্কেলকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এত সুন্দর বইগুলো উপহার দেয়ার জন্য। তিন গোয়েন্দার সবগুলো গল্পই আমার পছন্দ কিন্তু তার মধ্যেও কিছু কিছু বই আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে। এগুলোর মধ্যে ব্রাউন্সভিলে গণ্ডগোল, সীমান্তে সংঘাত, মাছেরা সাবধান, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য ও নকল কিশোর আমার কাছে বেশি ভাল লেগেছে। তিন গোয়েন্দা গল্পের বই পড়তে পড়তে ক্লাসে আমার নাম হয়ে গেছে গোয়েন্দা। কিছু কিছু সমস্যার কারণে আমি বইগুলো নিয়মিত পড়তে পারছি না। তার মধ্যে একটা সমস্যা হলো ময়মনসিংহে তিন গোয়েন্দা বইয়ের সাপ্লাই খুবই কম। এদিকটা দেখলে খুশি হব।

❋ চাহিদামত বই সরবরাহ করাই তো বিক্রেতার কাজ। তোমাদের চাহিদার কথা জানতে পারলে নিশ্চয়ই তিনি/তাঁরা তোমাদের পছন্দের বই সংগ্রহ করবেন। ...তুমি আমাদের সবার শুভেচ্ছা জেনো।

সেরা আলোচক :
তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১২৭-এর সেরা আলোচক মনোনীত হয়েছে :
মোঃ তুষার আহমেদ
মিরাশ পাড়া, টংগী, দক্ষিণ পাড়া, টংগী, গাজীপুর।
তোমার ঠিকানায় ২ কপি তিগো ভ. ১২৭ পাঠিয়ে দেয়া হলো।
যারা এই বিভাগে চিঠি লিখছ, তারা তাদের পূর্ণ ঠিকানা না দিলে কিন্তু পুরস্কার পৌঁছুবে না—কথাটা সবাই খেয়াল রেখো।
সবাইকে ধন্যবাদ। পুরস্কার জিতে নেওয়ায় **তুষার**কে অভিনন্দন।

অভিক দাস, মোবা: ০১৭৩৬-৯০৯২০৫ প্রযত্নে: রেজাউল করিম, বিল্ডিং-০২৩৭, ফ্ল্যাট-২০৪, পৌর মহিলা কলেজ রোড, বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ।

শুভেচ্ছা নেবেন। দু'দিন হলো জ্বর থেকে নিস্তার পেলাম। তবে জ্বরের সময় তিন গোয়েন্দার বইগুলো দারুণ লাগছিল। আমি হলাম তিন গোয়েন্দার অন্ধ ভক্তদের মধ্যে একজন। আমি এ পর্যন্ত তিন গোয়েন্দার শতাধিক বই পড়েছি ও আমার স্টকে জমা করেছি। তবে কোনও গল্পই আমার কাছে খারাপ লাগেনি। নওয়াব ভাইকে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কেননা, তিনি ব্যতিত আমি কোনওদিন তিন গোয়েন্দার সন্ধান পেতাম না। নওয়াব ভাইয়ের কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, তিন গোয়েন্দা কি কখনও কিশোরগঞ্জে আসবে?

আমার নিজেকে কিশোর পাশা ভাবতে অনেক ভাল লাগে। জানি না তার মত হতে পারব কি না।

❋ নিশ্চয়ই পারবে। খোঁজ-খবর রেখো, ওরা কিশোরগঞ্জে গেলেই ওদের সঙ্গে ভিড়ে যেয়ো – কদিনে পাক্কা ওস্তাদ হয়ে যাবে। শুভেচ্ছা রইল।

ত্রিপন চাক্মা, মোবা: ০১৮২৩৭৪৬৫০৫

গ্রা: মধ্য রাজদ্বীপ, চক্রপাড়া, ৮ নং ওয়ার্ড, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।

সেবা প্রকাশনীর সাথে জড়িত সকল পাঠক-পাঠিকাদের আমার শুভেচ্ছা। আর সেই সাথে দুই প্রিয় লেখকের প্রতিও আমার আন্তরিক ভালবাসা রইল। আমার দুই প্রিয় লেখক হলেন–নওয়াবদা ও রকিবদা। তাঁরা আমার প্রিয় হওয়ার কারণ তিন গোয়েন্দার মত এত চমৎকার সুন্দর সুন্দর বই উপহার দেওয়ার জন্য। আমি তিন গোয়েন্দার বই পড়ে খুঁজে পেলাম তিন বিশ্বস্ত বন্ধুকে। এরা হলো কিশোর পাশা, রবিন মিলফোর্ড এবং মুসা আমান। এরা তিনজন জানের দোস্ত। তাদের কথা কি ভুলতে পারি? অবশ্যই না। তারা এই বইয়ের চরিত্রে বন্ধুর প্রতি গভীর প্রেম-ভালবাসা আর মমত্ববোধ, রোমহর্ষক সমস্যা সমাধান করা এবং মানবতাবোধ, সব দিক দিয়ে অতুলনীয়। আমি জীবনে যত বই পড়েছি এই বইয়ের মত কাহিনি পাইনি। তাই আজ নিজেকে ধন্য মনে করছি। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা।

❋ তুমিও আমাদের সবার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জেনো।

মোঃ তুষার আহমেদ

মিরাশ পাড়া, টংগী, দক্ষিণ পাড়া, টংগী, গাজীপুর।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা, প্রথমেই সকলকে আমার সালাম ও ঘাসফুলের শুভেচ্ছা। আমি তিন গোয়েন্দার একজন পুরনো পাঠক ও পাগল ভক্ত। তিন গোয়েন্দার জন্য পাগল হয়ে পাবনা পাগলা গারদে কিছুদিন বাস করে এসেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি এখনও সমান ভাবে পাগলামী করে যাচ্ছি এবং আশা আছে ভবিষ্যতেও করে যাব। শা. নওয়াবদাকে ধন্যবাদ আমাকে পাগলামী করতে সাহায্য করার জন্য। তাঁর চমৎকার গল্পগুলো আমাকে পাগল করে তুলছে। নওয়াবদা, বাংলাদেশে পাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইলে আরও চমৎকার ও অসাধারণ বই লিখে যেতে হবে। যাঁরা এখনও তিন গোয়েন্দা পড়ে আমার মত পাগল হওনি তাদেরকে পাগল হওয়ার আমন্ত্রণ। সকলকে আমার পক্ষ থেকে পাগল করা শুভেচ্ছা।

❋ তোমার শুভেচ্ছা নওয়াবদা ছাড়া আর কাউকে গছানো গেল না। কেউ নিতে রাজি হয় না। সবাই তোমার ঘাসফুল নিয়েই খুশি। তোমার জন্যেও একটা ঘাসফুল পাঠাচ্ছি।

অচিরেই আসছে

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১২৮

স্বাধীনতা তুমি: শামসুদ্দীন নওয়াব: জাদুর ট্রী-হাউসে চড়ে কিশোর আর জিনা এবার যুদ্ধক্ষেত্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ স্বচোখে দেখল ওরা। চিনল জাতির পিতাকে। জানল স্বাধীনতার জন্য কতখানি মূল্য দিতে হয় একটি জাতিকে।

ভুতুড়ে জাহাজ: শামসুদ্দীন নওয়াব: ছুটিতে গ্রামে মুসার চাচাত ভাইয়ের বাড়িতে গেল তিন গোয়েন্দা, জিনা ও রেমন। একদিকে সুনীল সাগর, আরেকদিকে সবুজ অরণ্য, বইছে মস্ত নদী, তারই বুকে বিস্তৃত চর, নদী ও সাগরের পারে মায়াময় গ্রাম; এত সুন্দর জায়গায় এসে একবারও ভাবেনি ওরা বিপদের কথা। ...শুনে ফেলল ওরা ভয়ঙ্কর ডাকাতের পরিকল্পনা! ওদের দেখেও ফেলল তারা! কাজেই মরে ভূত হয়ে গেল ওরা!

লোভী শয়তান: শামসুদ্দীন নওয়াব: স্কুলের ছুটিতে স্যানফ্রান্সিসকো শহরে মার্টিন ভাইয়ের কাছে বেড়াতে গেল তিন গোয়েন্দা, এবং জড়িয়ে গেল ভয়ঙ্কর জটিল এক রহস্যে–কোথায় হারিয়ে যায় এত কঙ্কাল ও চামড়া? মানুষও কি এভাবে উধাও হয়? তদন্তের শুরুতেই চারপাশ থেকে এল হামলা! মুসা বলল, 'আমরা জ্যান্ত থাকতেই মাংস ছাড়িয়ে হাড়গোড় চুরি করবে কি না কে জানে!' বুকে সাহস নিয়ে রুখে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ওরা জানে না ওদের জন্য ফাঁদ পেতেছে ভয়ঙ্কর লোভী এক শয়তান!

বেরিয়ে গেছে

তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১২৫

জল্লাদের কবলে: শামসুদ্দীন নওয়াব: সোনারগাঁয়ে আছে এক ঐতিহাসিক কুখ্যাত জমিদার বাড়ি। ওটা দেখতে গেল কিশোর ও দিপু। ওটাই ওদের দোষ। ফেঁসে গেল ওরা ভয়ঙ্কর জল্লাদের চক্রান্তে। ওদের অতীতে নিয়ে গিয়ে খুন করবে সে–কিন্তু ওরা তো বাঁচতে চায়। পালাল ওরা, বারবার ফাঁকি দিল, কিন্তু শেষে?

পিশাচীর হাসি: শামসুদ্দীন নওয়াব: আইসক্রিম কাউন্টারের নতুন মেয়ে কর্মচারীটিকে দেখে আঁতকে উঠল তিন গোয়েন্দা আর ডানা। মেয়েটির মুখের চেহারা মড়ার মত ফ্যাকাসে। মুখে এক চিলতে হাসি নেই। চোখজোড়া নিষ্প্রাণ। ও কি মানুষ, নাকি অন্য কিছু?

জ্বাল দ্বীপ: শামসুদ্দীন নওয়াব: টেন্ট সেভেনের ক্যাম্পাররা সৈকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এসময় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ হলো। তারপর কোত্থেকে যেন উদয় হলো ধোঁয়াটে-ধূসর এক ছায়ামূর্তি। রহস্যময় বালি ছিটিয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে সে। কী উদ্দেশ্য তার?

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০